সাপ্তাহিক
প্রকাশনার ৩৪ বছর
অপরাধচিত্র



রাজপথেই ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করব : প্রধানমন্ত্রী

লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার





লাম্পট্যের অভিযোগে আওয়ামী আমলে বরখাস্ত

সেই জামানুরই জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী !

শেখ হাসিনা
ফিরবেন ! নাকি ফিরবেন না?



মুনাফার টোপে কোটি টাকা আত্মসাত
স্বপদে বহাল শহিদুল



চকরিয়া সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ঘুসের রাজা
সালাহউদ্দিন



সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলায় তথ্যপ্রাপ্তির জটিলতা সৃষ্টি করছেন
ইউএনও জনি রায়



পল্টিবাজ আওয়ামীপ্রেমী এখন বিএনপি পরিচয়ে আলোচিত
সুবিধাভোগী ফিরোজ মিয়া

অগ্রণী মাসিক আয় স্কিম

Agrani Monthly Income Scheme (AMIS)



গণমানুষের নিশ্চিত সহায় হয়ে
রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংক নিয়ে এলো
সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

এককালীন সঞ্চয় প্রতিমাসে আয়!

অলস অর্থ আর কোথাও নয়–এবার সঞ্চয় হোক **অগ্রণী ব্যাংকে!**
সর্বোচ্চ মুনাফার নিশ্চয়তায়, অগ্রণী মাসিক আয় স্কিম দিচ্ছে লাখ প্রতি

৯.৭৫% হারে মুনাফা।

- আমানতের বিপরীতে প্রতি মাসে মুনাফা প্রদান
- মুনাফার হার বার্ষিক ৯.৭৫%
- মেয়াদ ৩ বছর
- প্রয়োজনে মেয়াদ পূর্তির পূর্বে নগদায়নের সুযোগ
- এককালীন জমা টাকার পরিমাণ : ১ লক্ষ টাকা থেকে সর্বোচ্চ লক্ষ টাকার অংকে যে কোনো পরিমাণ অর্থ

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন–নিকটস্থ অগ্রণী ব্যাংকের যে কোন শাখায়

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.
Agrani Bank PLC.
দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
www.agranibank.org

সাপ্তাহিক প্রকাশনার ৩৪ বছর

অপরাধচিত্র

৩৪ বর্ষ ● ৩৩তম সংখ্যা ● ১৫-২১ নভেম্বর ২০২৬ ● রেজিঃ নং ডিএ ১২৩৪



সম্পাদকীয়

ব্যাংকিং অ্যাপ নিয়ে উদ্বেগ

ডিজিটাল ব্যাংকিং এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঘরে বসে টাকা পাঠানো, বিল পরিশোধ, কেনাকাটা কিংবা ব্যাংক হিসাবের তথ্য জানা, সবই সম্ভব হচ্ছে মোবাইল ফোনের একটি অ্যাপের মাধ্যমে। এতে সময় ও শ্রম দুটোই বাঁচছে। ব্যাংকে গিয়ে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন কমছে। কমছে নগদ টাকার ব্যবহারও। কিন্তু ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের এই সুবিধার সঙ্গে বাড়ছে সাইবার অপরাধের ঝুঁকি। গ্রাহকের অর্থ ও ব্যক্তিগত তথ্য কতটা নিরাপদ, সেই প্রশ্নও ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) সাম্প্রতিক গবেষণা এ ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরেছে। গবেষণায় অংশ নেওয়া ৩৪টি ব্যাংকের মাত্র ৩১ শতাংশের গ্রাহকসেবার অ্যাপে সাইবার হামলা বা নিরাপত্তাজনিত ঘটনা মোকাবিলার লিখিত পরিকল্পনা রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ৮১ শতাংশ ব্যাংক নিরাপত্তা-সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছে। কিন্তু মাত্র ৪৪ শতাংশ ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে লেনদেনের তথ্য ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। ফলে কোনো অস্বাভাবিক লেনদেন বা সন্দেহজনক তৎপরতা ঘটলে তা দ্রুত শনাক্ত করার সক্ষমতা অনেক ব্যাংকের নেই। সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক মিনিটের বিলম্বেও গ্রাহকের বড় অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিতে পারে অপরাধীরা। তাই শুধু তথ্য সংরক্ষণ করলেই দায়িত্ব শেষ হয় না। সার্বক্ষণিক নজরদারি এবং দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার সক্ষমতাও থাকতে হবে। ব্যাংকিং অ্যাপের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ফিশিং ও সামাজিক প্রকৌশলভিত্তিক প্রতারণা। প্রতারকরা নানা কৌশলে গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য, পাসওয়ার্ড ও গোপন নম্বর সংগ্রহ করে। অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহকের হিসাবের নিয়ন্ত্রণও নিয়ে নেয়। এ ধরনের অপরাধ ঠেকাতে প্রযুক্তিগত নিরাপত্তার পাশাপাশি গ্রাহকের সচেতনতা বাড়ানো জরুরি। ব্যাংকগুলোকে নিয়মিত সতর্কবার্তা দিতে হবে। আরেকটি উদ্বেগের বিষয় হলো, তৃতীয় পক্ষের প্রযুক্তিগত সেবাদাতাদের নিরাপত্তা। গবেষণায় অংশ নেওয়া ৭৮ শতাংশ ব্যাংক অন্তত একটি তৃতীয় পক্ষের তৈরি অ্যাপ ব্যবহার করে। কিন্তু মাত্র ৩৪ শতাংশ ব্যাংক এসব সেবাদাতার এপিআইয়ের নিরাপত্তাঝুঁকি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে। ফলে ব্যাংকের নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী হলেও বাইরের কোনো সেবাদাতার দুর্বলতা বড় বিপদের কারণ হতে পারে। তাই চুক্তি করার সময় থেকেই নিরাপত্তার শর্ত নিশ্চিত করতে হবে। তথ্য ফাঁস বা সাইবার হামলার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায় ও জবাবদিহি নির্ধারণ করতে হবে।

আমরা মনে করি, ব্যাংকিং অ্যাপের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কোটি কোটি গ্রাহকের সঞ্চয় ও ব্যক্তিগত তথ্য। ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হলে পুরো আর্থিক ব্যবস্থার ওপর তার প্রভাব পড়বে। তাই সাইবার হামলা মোকাবিলায় লিখিত ও পরীক্ষিত পরিকল্পনা, নিয়মিত নিরাপত্তা পরীক্ষা, জালিয়াতি প্রতিরোধ, তৃতীয় পক্ষের জবাবদিহি এবং দক্ষ জনবল নিশ্চিত করা দরকার। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংককে কঠোর তদারকি করতে হবে। প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে নিরাপত্তার অগ্রগতিও। গ্রাহকের অর্থ ও তথ্যের সুরক্ষায় কোনো ধরনের শিথিলতার সুযোগ নেই।

আইন উপদেষ্টা
ব্যারিস্টার মো. রাশিদুল ইসলাম

সম্পাদক
আলহাজ্ব মোঃ সাহিদুজ্জামান

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ আলমগীর হোসেন

মূল্য : ৩০ টাকা

সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয়
২৬ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ ব্যাভিলন সেন্টার
(৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০।

ফোন : ৮৮০-২-৯৫৫৯৮১৩
মোবাইল : ০১৭১৮-৩১৯২৮৩
০১৭৩২১৬০৬৭৩
ই-মেইল: aparadhchitra1234@gmail.com

মোঃ সাহিদুজ্জামান কর্তৃক এ. কে প্রিন্টার্স, ১৭২, আরামবাগ, থেকে মুদ্রিত এবং ৪৩/৫, এ, জিগাতলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

ভয়ংকর প্রতারক চক্রের ফাঁদ

কুমিল্লায় প্রবাসী ব্যবসায়ীর শত কোটি টাকার সম্পদ আত্মসাৎ



অপরাধচিত্র প্রতিবেদক : কুমিল্লার লাকসামে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যবসায়ী আব্দুল মমিনকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের দাবি, এর আগে একটি সংঘবদ্ধ হানিট্র্যাপের ফাঁদে ফেলে ব্ল্যাকমেইল ও প্রতারণার মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে নগদ দেড় কোটি টাকা এবং ১০ একরের বেশি জমি হাতিয়ে নেওয়া হয়। চক্রের জালিয়াতি ও সম্পদ আত্মসাতের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার আশঙ্কায় সড়ক দুর্ঘটনার নাটক সাজিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন নিহতের ছেলে।

দানবীর ও সমাজসেবক হিসেবে পরিচিত আব্দুল মমিনের মৃত্যুর প্রায় এক মাস পর তাঁর সম্পদ আত্মসাৎ, ব্ল্যাকমেইল ও প্রতারণার নানা তথ্য সামনে আসতে শুরু করে। এসব ঘটনায় দুই নারীসহ ১৫ জনকে আসামি করে গত ৫ নভেম্বর কুমিল্লার আদালতে মামলা করেন তাঁর ছেলে। আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে তদন্তের দায়িত্ব লাকসাম থানা পুলিশকে দিয়েছেন।

মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত ১৬ আগস্ট ২০২৬, রবিবার রাত আনুমানিক ৯টার দিকে কুমিল্লা-চাঁদপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের লাকসাম উপজেলার বিজরা বাজারের উত্তর পাশে এমআরএফ ফিলিং স্টেশনের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে। ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে চাঁদপুরমুখী লেনে পৌঁছালে পেছন দিক থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা আব্দুল মমিনকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মহানগরীর মডার্ন হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে ওই রাতেই উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৭ আগস্ট দিবাগত রাত সাড়ে ৪টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে সড়ক দুর্ঘটনা বলে মনে করেছিল পরিবার। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে লাকসাম থানায় অভিযোগ করা হলে ২০২৬ সালের ২০ আগস্ট সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮-এর ৯৮ ও ১০৫ ধারায় মামলা নম্বর ৬ দায়ের করা হয়।

তবে নিহতের ছেলে ও মামলার বাদী ফখরুল ইসলামের দাবি, তাঁর বাবা একটি সংঘবদ্ধ হানিট্র্যাপ চক্রের ফাঁদে পড়েছিলেন। চক্রের সদস্যরা তাঁর বাবার সরলতা ও বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন নগ্ন ছবি ও ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল শুরু করেন। এসব ছবি ও ভিডিও প্রকাশের ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন সময়ে তাঁর কাছ থেকে নগদ প্রায় দেড় কোটি টাকা আদায় করা হয়।

অভিযোগে আরও বলা হয়, আব্দুল মমিনের স্বাক্ষর নেওয়া অলিখিত চেক ও নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ব্যবহার করে এক হাজার শতকেরও বেশি জমি চক্রের সদস্যদের নামে দলিল ও পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে রেজিস্ট্রি করে নেওয়া হয়। এসব সম্পদের মূল্য কয়েকশ কোটি টাকা বলে দাবি পরিবারের।

মামলার বাদীর দাবি, এ ঘটনায় এর আগেও ২০২৪ সালের ৪ মে কুমিল্লা কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা করেছিলেন তিনি। মামলাটির নম্বর ১২, জিআর নম্বর ৩৭০/২৪। ওই মামলায় পুলিশ অভিযোগপত্র দাখিল করেছে এবং বর্তমানে সেটি আদালতে বিচারাধীন।

ফখরুল ইসলামের অভিযোগ, আগের মামলার ভিকটিম ও সাক্ষী হওয়ায় এবং হানিট্র্যাপের মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া সম্পদ হারানোর আশঙ্কায় চক্রের সদস্যরা তাঁর বাবাকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ঘটনার দিন তাঁদের নিয়ন্ত্রিত একটি অটোরিকশা দিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়। পরে ঘটনাটিকে সড়ক দুর্ঘটনা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয় বলে দাবি তাঁর।

রবিউলের মৃত্যুর পর সামনে আসে সম্পদ ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব : বাদীর ভাষ্য অনুযায়ী, হানিট্র্যাপ চক্রের অন্যতম হোতা হিসেবে অভিযুক্ত নিহত ব্যবসায়ী আব্দুল মমিনের বিশ্বস্ত দলিল লেখক বরুড়ার গালিমপুর এলাকার রবিউল। রবিউলের মৃত্যুর পর আব্দুল মমিনের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া অর্থ ও সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে চক্রের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

অভিযোগে বলা হয়, রবিউলের স্ত্রী ফাতেমা পারভীন জান্নাত, যিনি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সহকারী হিসেবে কর্মরত, তাঁকে ঘিরেও নানা তথ্য সামনে এসেছে। রবিউল ও ফাতেমা পারভীনের কথিত বিবাহবিচ্ছেদ এবং রবিউলের মৃত্যুর পর সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে চক্রের সদস্যদের মধ্যে বিরোধ বাড়তে থাকে। এর মধ্য দিয়ে প্রতারণা ও সম্পদ আত্মসাতের নানা তথ্য প্রকাশ পেতে শুরু করে।

নিহতের ছেলে জানান, পরে এলাকাবাসী ও বিভিন্ন সাক্ষীর কাছ থেকে তিনি এসব ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানতে পারেন। তাঁর দাবি, বাবার মৃত্যুর ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা ছিল না,বরং সম্পদ আত্মসাৎ ও প্রতারণার ঘটনা আড়াল করতেই পরিকল্পিতভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনি আরও দাবি করেন, হত্যা মামলায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় প্রতারণার সঙ্গে জড়িত চক্রের কয়েকজন ইতিমধ্যে জালিয়াতির বিষয়টি স্বীকার করেছেন। একই সঙ্গে তাঁদের নামে দলিল করা বেশ কিছু জমি নিহত আব্দুল মমিনের সন্তানদের ফেরতও দিয়েছেন।

পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য, আব্দুল মমিনের মৃত্যুর পর শোক ও মানসিক বিপর্যয়ের কারণে সব তথ্য সংগ্রহ এবং আদালতে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিতে তাঁদের কিছুটা সময় লেগেছে।

মামলার বাদীর দাবি, এ ঘটনায় একাধিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষী রয়েছেন। বিচারিক প্রক্রিয়ায় তাঁরা আদালতে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরবেন।

তবে আব্দুল মমিনের মৃত্যুর ঘটনাটি পরিকল্পিত হত্যা, নাকি সড়ক দুর্ঘটনা তা তদন্তের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। একইভাবে হানিট্র্যাপ, ব্ল্যাকমেইল, জমি আত্মসাৎ ও সম্পদ ভাগাভাগি নিয়ে ওঠা অভিযোগগুলোরও নিরপেক্ষ তদন্ত জরুরি। আদালতে দায়ের করা মামলার তদন্তে এসব অভিযোগের সত্যতা ও ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হবে বলে প্রত্যাশা ভুক্তভোগী পরিবার ও এলাকাবাসীর।



সেতুর জন্য ২৩ বছর অপেক্ষা

অপরাধচিত্র প্রতিবেদন : রাত তখন পৌনে ২টা। চারদিকে নিঝুম অন্ধকার, কেবল বালু নদের কালো জলে বাতাসের ছপ ছপ শব্দ।

কায়েতপাড়ার গর্ভবতী নারী রেশমা বেগমকে যখন প্রসববেদনা আঁকড়ে ধরল, তখন তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে পরিবারটির সামনে আড়াই কিলোমিটার দূরের ঝুঁকিপূর্ণ নগরপাড়া খেয়াঘাট। ভাঙা বাঁশের সাঁকো আর অন্ধকারে খুঁজে পাওয়া একটি কাঠের ডিঙি নৌকা ছাড়া পারাপারের আর কোনো বিকল্প নেই। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা ওই নারীকে নিয়ে স্বজনরা খেয়াঘাটে পৌঁছালেন। কিন্তু মাঝির ঘুম ভাঙাতে আর খেয়া পার হতে পেরিয়ে গেল অমূল্য ৪৫ মিনিট।

হাসপাতালে পৌঁছার আগেই অন্ধকার নদীর বুকেই নিভে গেল এক নতুন প্রাণের স্পন্দন।

হাসপাতালে পৌঁছার আগে গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুতে রেশমা বেগমের এই কান্না কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সংকটাপন্ন অন্য রোগীদের ক্ষেত্রেও ঘটছে মর্মান্তিক ঘটনা। নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার কায়েতপাড়া ইউনিয়নে বালু নদের ওপর নির্মিতব্য নগরপাড়া সেতুর ২৩ বছরের ইতিহাস বস্তুত এমনই হাজারো চাখের জল, হারিয়ে যাওয়া স্বপ্ন আর অবহেলার এক দীর্ঘ দস্তাবেজ।

রামপুরা-কায়েতপাড়া আঞ্চলিক সংযোগ সড়কের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র এই নগরপাড়া। ঢাকাসংলগ্ন এই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুই দশক ধরে একাধিক সরকার এসেছে, ক্ষমতা বদলেছে, কিন্তু বদলায়নি প্রায় চার লাখ মানুষের নৈমিত্তিক দুর্ভোগের চিত্র। ২৩ বছর ধরে ঝুলে থাকা একটি সেতু নির্মাণে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কিভাবে একটি জনপদের অর্থনীতি, শিক্ষা ও সামাজিক জীবনকে জিম্মি করে রাখতে পারে–তার এক প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণের অপেক্ষায় থাকা এই নগরপাড়া সেতু।

২৩ বছর ধরে যা হচ্ছে : খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকার রামপুরা থেকে ডেমরা-আমুলিয়া হয়ে রূপগঞ্জের কায়েতপাড়া ও রূপগঞ্জ সদরের দূরত্ব বহুলাংশে কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ২০০১ সালের দিকে রামপুরা-কায়েতপাড়া সড়ক উন্নয়ন ও বালু নদের ওপর নগরপাড়া সেতু নির্মাণের রূপরেখা তৈরি হয়। পরিকল্পনা ছিল, ঢাকা শহরসংলগ্ন এই রুটে একটি পিসি গার্ডার সেতু নির্মিত হলে রাজধানীর সঙ্গে রূপগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যাতায়াতের সময় প্রায় এক থেকে দেড় ঘণ্টা কমে আসবে।

কিন্তু কাজের শুরুতে এবং পরবর্তী সময়ে দুই দফায় দরপত্র আহ্বান করা হলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর অব্যবস্থাপনায় তা থমকে যায়। নারায়ণগঞ্জ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগের তত্ত্বাবধানে সেতুটি নির্মাণের দায়িত্ব পেয়েছিল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইস্টার্ন ট্রেডার্স লিমিটেড। চুক্তি অনুযায়ী এক বছরের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে মাত্র ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ ও উত্তোলন করার পর আর কোনো অর্থ ছাড় করা হয়নি। পরে সিমেন্ট, রড, বালু ও পাথরের মতো নির্মাণসামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় এবং পর্যাপ্ত বরাদ্দের অভাবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। দীর্ঘদিন ধরে কেবল নদের মাঝে দুটি পিয়ার, কলাম ও অ্যাবাটমেন্টের কাজ হয়েই প্রজেক্টটি স্থবির হয়ে পড়ে। সূত্রটি আরো জানায়, দীর্ঘ প্রায়

দুই যুগ পর ২০২১ সালে অসমাপ্ত এই সেতুটির নির্মাণকাজ শেষ করতে দ্বিতীয় দফায় নতুন করে দরপত্র আহ্বান করা হয়। এ সময় নতুন করে প্রায় ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। যৌথভাবে সেতুটি বাস্তবায়নের কাজ পায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইউনুস অ্যান্ড ব্রাদার্স এবং মেসার্স সরদার এন্টারপ্রাইজ (জেভি)। ২০২১ সালের মে মাসে কাজ পুনরায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও অদৃশ্য কারণে সেই কাজও মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায়, ফলে পড়ে থেকে, মরিচা ধরে নষ্ট হতে শুরু করেছে কোটি টাকার নির্মাণসামগ্রী।

প্রাত্যহিক দুর্ভোগ, থমকে থাকা অর্থনীতি ও ভবিষ্যৎ : নগরপাড়া খেয়াঘাট পার হয়ে প্রতিদিন ঢাকায় যাতায়াত করে হাজার হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পোশাক কারখানার শ্রমিক, সবজি চাষি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। নদের ওপারেই রাজধানী ঢাকার বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্রগুলো হলেও একটি ব্রিজের অভাবে এই পুরো অঞ্চলের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, কায়েতপাড়া ও সংলগ্ন গ্রামগুলোতে উৎপাদিত তাজা সবজি, দুধ ও অন্যান্য কৃষিপণ্য দ্রুত ঢাকায় সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। রাত থাকতে খেয়াঘাটে সবজিভর্তি ভ্যান নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়। ফলে অনেক পণ্য পথেই নষ্ট হয় অথবা ফড়িয়াদের কাছে পানির দরে বিক্রি করতে বাধ্য হন কৃষক। নগরপাড়া এলাকার বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন মোল্লা বলেন, হৃদরোগ, স্ট্রোক কিংবা প্রসূতি রোগীদের ক্ষেত্রে প্রতিটি সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রাতে খেয়া পারাপার বন্ধ থাকলে কিংবা অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলের উপায় না থাকায় বহু রোগী সঠিক সময়ে ঢাকায় হাসপাতালে পৌঁছাতে না পেরে পথেই প্রাণ হারান। শামীম মিয়া নামের স্থানীয় আরেকজন বলেন, নদীর এপারে সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ওপারে ঢাকার বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করা ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিনিয়ত জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খেয়া পার হয়। বর্ষাকালে নদী যখন উত্তাল থাকে, তখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিশুদের স্কুলে পাঠানো বন্ধ রাখতে বাধ্য হন অভিভাবকরা।

এলাকাবাসীর তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা : নগরপাড়ার ভুক্তভোগী স্থায়ী বাসিন্দারা এই সেতু নির্মাণে দীর্ঘ ২৩ বছরের অবহেলা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন। শিক্ষিকা ডলি করিম বলেন,

২৩ বছর এক দীর্ঘ সময়। একটি সেতুর অপেক্ষায় একটি জনপদের তিন প্রজন্ম পার হয়ে যাচ্ছে। অবহেলার আর আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কাটিয়ে দ্রুততম সময়ে নগরপাড়া বালু নদের ওপর কাঙ্ক্ষিত এই সেতুর কাজ শুরু করাই এখন কায়েতপাড়াবাসীর একমাত্র দাবি। তাঁরা চান না আর কোনো রেশমা বেগমকে মাঝনদীতে গর্ভস্থ সন্তান হারাতে হয়, আর কোনো শিক্ষার্থীকে বইখাতা ভাসিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়

'আমরা তো রাজনীতি বুঝি না, আমরা বুঝি আমাদের যাতায়াত। কত চেয়ারম্যান, এমপি আইল আর গেল, ভোটের আগে সবাই সেতুর ওয়াদা দেয়। কিন্তু ভোট পার হইলেই নগরপাড়ার ব্রিজের কথা কেউ মনে রাখে না। ২৩টা বছর ধরে আমাদের চোখের সামনে পোলাপাইন নদীতে পড়ে ভিজা বই নিয়া কানতে কানতে বাড়ি ফিরে। এই দুঃখ থেইকা আমাদের মুক্তি কবে?'

সালাউদ্দিন মিয়া ওরফে ফালা বলেন, 'আমার ছোট ছেলেটা কায়েতপাড়া হাই স্কুলে পড়ে। বর্ষাকালে যখন বৃষ্টি নেমে নদীর পানি বাড়ে, তখন খেয়া নৌকায় ওকে একা ছাড়তে বুকের ভেতর কাঁপে। একটা ব্রিজের জন্য পুরো ইউনিয়নের মানুষকে এভাবে জিম্মি করে রাখার কোনো মানে হয় না। রাতে কোনো মানুষ অসুস্থ হইলে হাসপাতালে নেওয়ার কোনো উপায় থাকে না।'

বাগবাড়ী এলাকার সবজি বিক্রেতা ধলু মিয়া বলেন, 'ঢাকা শহর আমাদের চোখের সামনে, অথচ একটা সেতুর অভাবে আমরা যেন কোনো দূরদ্বীপে বাস করতেছি। রামপুরা পৌঁছাইতে মাত্র ৮-১০ মিনিট লাগার কথা, সেখানে আমাদের ঘুরে ডেমরা হইয়া যাইতে দেড় ঘণ্টা লাগে। সময় আর তেলের খরচে আমরা শেষ। ব্রিজটা হইলে আমাদের ব্যবসার চেহারা পাল্টাইয়া যাইত।'

কর্তৃপক্ষের 'হবে-হচ্ছে' আশ্বাস : এত বছর ধরে কেন ঝুলে আছে গুরুত্বপূর্ণ এই নগরপাড়া সেতুর নির্মাণকাজ? এই প্রশ্নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) রূপগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী আক্তার হোসেন জানান, বিষয়টি সওজের। আমাদের কোনো এখতিয়ার নেই। তবে বালু নদ একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হওয়ায় বিআইডাব্লিউটিএর নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স বা নাব্যতার নিয়ম মেনে ব্রিজের উচ্চতা এবং স্প্যান রি-ডিজাইন করতে হবে।

নারায়ণগঞ্জ সড়ক ও জনপথের নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুর রহিমের বক্তব্য নিতে তাঁর ব্যবহৃত সেলফোনে কয়েকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। নারায়ণগঞ্জ সড়ক ও জনপথের নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুর রহিম বলেন, নতুন করে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। কোনো জটিলতা তৈরি না হলে সেতু হবে।

স্থায়ী সমাধান দাবি এলাকাবাসীর : কায়েতপাড়া ও রূপগঞ্জবাসীর কাছে নগরপাড়া সেতু কেবল ইট-পাথর আর লোহা-লক্কড়ের কোনো অবকাঠামো নয়; এটি চার লাখ মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্ন, অর্থনৈতিক মুক্তির পথে বাধা অপসারণ। রামপুরা থেকে নগরপাড়া হয়ে রূপগঞ্জের এই রুটটি চালুর মাধ্যমে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ওপর থেকেও যানবাহনের বাড়তি চাপ অনেকাংশে কমানো সম্ভব বলে এলাকাবাসী মনে করছেন।

এখানে একটি স্থায়ী পিসি গার্ডার সেতু নির্মিত হলে রামপুরা থেকে রূপগঞ্জের যাতায়াত সময় নেমে আসবে মাত্র ৮ থেকে ১০ মিনিটে। ডেমরা ও কাঞ্চন ব্রিজের ওপর বাড়তি যানবাহনের চাপ অনেকাংশে কমবে।

স্থানীয় কৃষিপণ্য সরাসরি রাজধানীর বাজারে সঠিক সময়ে পৌঁছাবে, যা আঞ্চলিক অর্থনীতিতে গতি আনবে। জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হবে এবং শিশুদের শিক্ষাজীবনের ঝুঁকি দূর হবে।

তাঁরা বলছেন, ২৩ বছর এক দীর্ঘ সময়। একটি সেতুর অপেক্ষায় একটি জনপদের তিন প্রজন্ম পার হয়ে যাচ্ছে। অবহেলার আর আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কাটিয়ে দ্রুততম সময়ে নগরপাড়া বালু নদের ওপর কাঙ্ক্ষিত এই সেতুর কাজ শুরু করাই এখন কায়েতপাড়াবাসীর একমাত্র দাবি। তাঁরা চান না আর কোনো রেশমা বেগমকে মাঝনদীতে গর্ভস্থ সন্তান হারাতে হয়, আর কোনো শিক্ষার্থীকে বইখাতা ভাসিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়। নারায়ণগঞ্জ-১ (রূপগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান ভূইয়া দিপু এ সেতু দ্রুত নির্মাণের জন্য জাতীয় সংসদে প্রস্তাব রেখেছেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে দৌড়ঝাঁপ করছেন।

রমজানে ৫২০ ট্রাকে পণ্য বিক্রি করবে টিসিবি

ভোজ্য তেল, ডাল, চিনি, ছোলা ও খেজুর আমদানির বড় প্রস্তুতি

অপরাধচিত্র প্রতিবেদক : আগামী রমজানে নিত্যপণ্যের বাজারে বাড়তি চাহিদা সামাল দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সরকারি বিপণন সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এবার সারা দেশে প্রতিদিন ৫২০টি ট্রাকে পণ্য বিক্রির পরিকল্পনা করেছে।

গত রমজানে ৪৫০টি ট্রাকে পণ্য বিক্রি করা হয়েছিল। এবার উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৪ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৪০ লাখ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।



রমজানের বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে ভোজ্য তেল, মসুর ডাল ও চিনি অতিরিক্ত আমদানির প্রস্তুতি নিচ্ছে টিসিবি। পাশাপাশি ছোলা ও খেজুর সংগ্রহের পরিকল্পনা রয়েছে।

স্মার্ট কার্ডধারীদের বাইরে কার্ডবিহীন সাধারণ ভোক্তাদের জন্যও খোলাবাজারে পণ্য বিক্রির (ওএমএস) উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ফলে রমজানে নিম্ন আয়ের মানুষের পাশাপাশি সাধারণ ভোক্তাদের জন্য সাশ্রয়ী দামে পণ্য কেনার সুযোগ বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে সরকারের।

টিসিবির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ফয়সল আজাদ বলেন, রমজানে পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে সংস্থাটির নিজস্ব ক্রয় পরিকল্পনা রয়েছে। সে অনুযায়ী প্রস্তুতি এগিয়ে চলছে। নিয়মিত পণ্য সরবরাহে কোনো সমস্যা হবে না।

তিনি জানান, স্মার্ট কার্ডের নিয়মিত কার্যক্রমের বাইরে আরো বেশি মানুষের কাছে পণ্য পৌঁছে দিতে সরকার অতিরিক্ত বিক্রির বিষয়টি বিবেচনা করছে। এ লক্ষ্যে ভোজ্য তেল, ডাল ও চিনি আমদানির জন্য বিদেশি সরবরাহকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। কিছু পণ্যের জন্য দরপত্রও আহ্বান করা হয়েছে। তবে অতিরিক্ত আমদানির পরিমাণ এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে টিসিবি বড় ধরনের ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এর আওতায় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে ২২ কোটি লিটার ভোজ্য তেল, দুই লাখ ২০ হাজার টন মসুর ডাল, এক লাখ ১০ হাজার টন চিনি, ১৪ হাজার টন ছোলা এবং চার হাজার ৪০০ টন খেজুর সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

রমজানে সাধারণত ভোজ্য তেল, চিনি, ডাল, ছোলা ও খেজুরের চাহিদা বেড়ে যায়। বিশেষ করে ইফতারসামগ্রী তৈরিতে ছোলা ও খেজুরের ব্যবহার বেশি হওয়ায় এ দুটি পণ্যের বাজারে বাড়তি চাপ তৈরি হয়। ভোজ্য তেল, চিনি ও ডালের চাহিদাও বাড়ে। ফলে রমজানের আগে আমদানি, মজুদ ও সরবরাহব্যবস্থা ঠিক রাখা সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের (বিটিটিসি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত প্রধান কয়েকটি ভোগ্য পণ্যের আমদানি আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রায় চার মাসে দেশে ভোজ্য তেল আমদানি হয়েছে আট লাখ ২৩ হাজার টন। গত অর্থবছরের একই সময়ে আমদানি হয়েছিল সাত লাখ পাঁচ হাজার টন। এ সময়ে ভোজ্য তেলের জন্য আট লাখ পাঁচ হাজার টনের ঋণপত্র (এলসি) খোলা হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এক লাখ ৩১ হাজার টন বেশি।

একই সময়ে সয়াবিন বীজ আমদানি বেড়ে পাঁচ লাখ এক হাজার টনে দাঁড়িয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে এক লাখ ১৩ হাজার টন। অপরিশোধিত সয়াবিন তেল উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে সয়াবিন বীজের আমদানি বাড়াও ভোজ্য তেলের সরবরাহ পরিস্থিতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

চলতি অর্থবছরের ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত দেশে চিনি আমদানি করা হয়েছে ছয় লাখ ৮৭ হাজার টন। আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় আমদানি বেড়েছে এক লাখ ৫৩ হাজার টন। এ সময়ে চিনির জন্য আট লাখ ১০ হাজার টনের এলসি খোলা হয়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে দেশে ছোলা আমদানি করা হয়েছিল ১২ হাজার টন। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রায় চার মাসে তা বেড়ে ৮২ হাজার টন হয়েছে। এ সময়ে ছোলার জন্য এলসি খোলা হয়েছে এক লাখ ৩৮ হাজার টনের।

মসুর ডাল আমদানি করা হয়েছে এক লাখ ২২ হাজার টন, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬৪ হাজার টন বেশি। এ পণ্যের জন্য এলসি খোলা হয়েছে এক লাখ ১৪ হাজার টনের। অন্যদিকে খেজুর আমদানি বেড়ে ১১ হাজার টন হয়েছে। গত অর্থবছরে একই সময়ে আমদানি করা হয়েছিল চার হাজার টন।

আমদানি বৃদ্ধি এবং টিসিবির বাড়তি ক্রয় পরিকল্পনা রমজানের বাজার ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিলেও শুধু পণ্যের সরবরাহ বাড়িয়ে বাজার স্থিতিশীল রাখা সম্ভব নয়। আমদানি করা পণ্য সময়মতো বন্দরে খালাস, পরিবহন, গুদামজাত এবং পাইকারি ও খুচরা বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। মজুদদারি, কৃত্রিম সংকট ও অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে বাজার তদারকি জোরদার করাও প্রয়োজন।

বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম, ডলারের বিনিময় হার, আমদানি ব্যয় এবং বন্দর ব্যবস্থাপনার ওপর দেশের ভোগ্য পণ্যের বাজার অনেকাংশে নির্ভরশীল। আমদানি বাড়লেও সরবরাহব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটলে তার প্রভাব খুচরা বাজারে পড়তে পারে। তাই শুধু আমদানির পরিমাণ নয়, বাজারে পণ্য পৌঁছানোর সময় ও নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করাও জরুরি। পণ্য বিক্রিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।



হরমুজ প্রণালী বন্ধ বা জাহাজে হামলার অধিকার কোনো রাষ্ট্রের নেই

–ক্যাপ্টেন রেদওয়ান

অপরাধচিত্র প্রতিবেদক : বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করা কিংবা সেখানে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালানোর অধিকার ইরান বা যুক্তরাষ্ট্র–কোনো রাষ্ট্রেরই নেই বলে মন্তব্য করেছেন মাস্টার মেরিনার ক্যাপ্টেন রেদওয়ান সিকদার। তিনি বলেছেন, হরমুজ প্রণালী কোনো দেশের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এটি আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ পথ। তাই রাজনৈতিক বিরোধ বা সামরিক উত্তেজনার কারণে এ নৌপথে জাহাজ চলাচল বাধাগ্রস্ত করা গ্রহণযোগ্য নয়।

জাপানভিত্তিক এনওয়াইকে শিপ ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত ক্যাপ্টেন রেদওয়ান সিকদার। পাশাপাশি তিনি সাউথ এশিয়ান স্ট্র্যাটেজিক কংগ্রেসের মেরিটাইম অ্যাম্বাসাডর। হরমুজ প্রণালী ঘিরে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্য, জ্বালানি সরবরাহ এবং নাবিকদের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব তুলে ধরে ক্যাপ্টেন রেদওয়ান বলেন, পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে এই নৌপথ। বিশ্বের বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এ পথ দিয়ে পরিবহন করা হয়। সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, কুয়েত, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের জ্বালানি রপ্তানির বড় অংশ এই প্রণালীর ওপর নির্ভরশীল।

তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সমুদ্রপথে বিশ্বে পরিবাহিত তেলের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এবং বৈশ্বিক এলএনজি বাণিজ্যের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হরমুজ প্রণালী দিয়ে যায়। বিশেষ করে কাতারের এলএনজি রপ্তানির বড় অংশ এ নৌপথনির্ভর। ফলে এখানে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হলে এশিয়াসহ বিশ্ববাজারে জ্বালানি সরবরাহ ও দামে বড় ধরনের প্রভাব পড়তে পারে।

আন্তর্জাতিক আইনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, জাতিসংঘের সমুদ্র আইনবিষয়ক কনভেনশন (আনক্লস)-এর ৩৮ ও ৪৪ অনুচ্ছেদে আন্তর্জাতিক প্রণালী দিয়ে ট্রানজিট প্যাসেজের অধিকার এবং নির্বিঘ্নে জাহাজ চলাচলের নীতি স্বীকৃত হয়েছে। কোনো রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন ও সামুদ্রিক নীতিমালার ঊর্ধ্বে নয়। ইরান কিংবা যুক্তরাষ্ট্র–কেউই একতরফাভাবে আন্তর্জাতিক নৌ চলাচলের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত করতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, ১৯৮৮ সালের সাপ্রেশন অব আনলফুল অ্যাক্টস অ্যাগেইনস্ট দ্য সেফটি অব মেরিটাইম নেভিগেশন (এসইউএ) কনভেনশন অনুযায়ী, জাহাজে বেআইনি বল প্রয়োগ, দখল কিংবা ক্ষতিসাধনের মতো কর্মকাণ্ড অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। একইভাবে জাতিসংঘ সনদের ২(৪) অনুচ্ছেদে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্য রাষ্ট্রের অধিকার ক্ষুণ্ন করার বিরুদ্ধে নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

হরমুজ প্রণালী ঘিরে সামরিক উত্তেজনার প্রভাব শুধু জ্বালানি খাতে সীমাবদ্ধ নয় উল্লেখ করে ক্যাপ্টেন রেদওয়ান বলেন, ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন, নৌ-অভিযান, জাহাজ আটক ও হামলার ঝুঁকিতে রয়েছেন বাণিজ্যিক জাহাজের নাবিকেরা। এর ফলে তাঁদের প্রাণহানি, আহত হওয়া, দীর্ঘদিন সমুদ্রে আটকে থাকা, খাদ্য ও চিকিৎসাসংকট এবং পরিবারের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনসের (ইউকেএমটিও) ৬ নভেম্বরের পরিসংখ্যানে ২৮ ফেব্রুয়ারি সংঘাত শুরুর পর থেকে প্রায় ১৫৫টি জাহাজে হামলার তথ্য রয়েছে। এসব ঘটনায় ২৫ জন নাবিক নিহত এবং ৮২ জন গুরুতরভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। এ ছাড়া প্রায় ৪০০টি জাহাজে ছয় হাজার নাবিক পারস্য উপসাগর ও ইরান-সংলগ্ন এলাকায় আটকে পড়েছেন বলে দাবি করেন তিনি।

ক্যাপ্টেন রেদওয়ান বলেন, বাণিজ্যিক জাহাজ কোনো যুদ্ধজাহাজ নয়। এসব জাহাজের মাস্টার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, কর্মকর্তা, নাবিক কিংবা ক্যাডেট–কেউই সামরিক সংঘাতের পক্ষ নন। তাঁরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সচল রাখার দায়িত্ব পালন করেন। তাই তাঁদের জীবনকে কোনোভাবেই সামরিক সংঘাতের ঝুঁকিতে ফেলা উচিত নয়।

এ পরিস্থিতিতে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা বন্ধ, নিরীহ নাবিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত, আটকে পড়া জাহাজ ও নাবিকদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা এবং নিহত ও আহত নাবিকদের পরিবারের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ক্যাপ্টেন রেদওয়ান বলেন, 'আমরা কোনো যুদ্ধের পক্ষ নই। আমরা আন্তর্জাতিক আইন, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং মানবতার পক্ষে। একটি বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা মানে শুধু একটি জাহাজকে আক্রমণ করা নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নিরস্ত্র নাবিকদের জীবন, বিশ্ব অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক সরবরাহব্যবস্থার নিরাপত্তা।'



রাজপথেই ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করব : প্রধানমন্ত্রী

লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার

আমরা রাজপথে আছি, রাজপথে আমাদের থাকতে হবে। রাজপথেই সব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে

অপরাধচিত্র প্রতিবেদন : গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফিরতে চাইলে সরকার দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। তবে এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে নাশকতা-বিশৃঙ্খলার চেষ্টা প্রতিহত করা হবে। সব ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় দলীয় সংসদ সদস্যদের রাজপথে থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গত ৯ নভেম্বর সোমবার বিকালে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশন শুরুর আগে সংসদে সরকারদলীয় সভাকক্ষে তিনি এ নির্দেশনা দেন। সভার সভাপতিত্ব করেন সংসদনেতা ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

সভায় উপস্থিত একাধিক দায়িত্বশীল ব্যক্তি সূত্রে জানা যায়, সভা শুরুর কয়েক মিনিট পর শেখ হাসিনার দেশে ফেরার প্রসঙ্গ উঠে। সেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জানান, শেখ হাসিনা দেশে ফিরতে চাইলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যমান প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন, বিধি ও প্রথা অনুসরণ করা হবে। এক পর্যায়ে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, 'বক্তব্য লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার, আমরা রাজপথে আছি, রাজপথে আমাদের থাকতে হবে। রাজপথেই সব ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে।' একটি সূত্র জানায়, শেখ হাসিনার ফেরা ইস্যুতে তারেক রহমান সরাসরি কোনো বক্তব্য দেননি। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও দেশি-বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র থেমে নেই-এমনটা জানিয়ে তিনি সংসদ সদস্যদের রাজপথে সক্রিয় থাকার নির্দেশনা দেন।

একাধিক সূত্রে জানা যায়, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সবাইকে সর্তক করেন। জনগণের জানমালের নিরাপত্তাসহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সবাইকে কাজ করার নির্দেশনা দেন। সূত্র জানায়, সভায় দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা, সড়ক উন্নয়ন, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। রমজান সামনে রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার পরিস্থিতিও আলোচনায় স্থান পায়। এ সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের কাছে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবহিত করেন।

শ্রমিকদের চিকিৎসায় ছয়টি ১০০ শয্যার হাসপাতাল নির্মাণ করবে সরকার : শ্রমজীবী মানুষের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে দেশের ছয়টি শিল্পাঞ্চলে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ছয়টি হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। হাসপাতালগুলোতে শুধু শ্রমিকদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হবে। সোমবার জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ পরিকল্পনার কথা জানান।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এক যুগের বেশি সময় স্বৈরাচারের দুঃসহ শাসনামলে বাংলাদেশের জ্বালানি ব্যবস্থাকে বিদেশনির্ভর করে ফেলা হয়েছিল। দেশের খনিজসম্পদ দেশের মানুষের কাজে ব্যবহার না করে সবকিছু আমদানিনির্ভর করা হয়েছিল। দেশে শিল্পের বিকাশ না ঘটিয়ে দেশকে আমদানিনির্ভর করে ফেলা হয়েছিল। এমন সব ইচ্ছাকৃত নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল-যার ফলে দেশে শিল্পের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে পারেনি। একইভাবে স্বৈরাচারের আমলে বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে গ্রামীণ মানুষের চিকিৎসাব্যবস্থা অতীতে গণতান্ত্রিক সরকারের সময় যতটুকু ছিল, সেটাও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, কিছুদিন আগেই জাতীয় সংসদের একটি অধিবেশনে বিরোধীদলীয় নেতাও বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে তার উদ্বেগ তুলে ধরেছিলেন।

তারেক রহমান বলেন, বর্তমান সরকার বাংলাদেশের মানুষের ভোটে নির্বাচিত। দেশের প্রত্যেক শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য সরকার কাজ করছে। একইভাবে শ্রমিকদের চিকিৎসার বিষয়টিও সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। তিনি বলেন, শ্রমজীবী মানুষের সুচিকিৎসার সুবিধার জন্য সরকার এরই মধ্যে ১০০ বেডের করে ছয়টি হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশের শিল্পাঞ্চল হিসাবে খ্যাত টঙ্গী, আশুলিয়া, কালিয়াকৈর, নারায়ণগঞ্জ, সাভার ও চট্টগ্রামে প্রাথমিকভাবে এসব হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে। হাসপাতালগুলো শুধু শ্রমিকদের চিকিৎসাসেবা দেবে।

মুনাফার টোপে কোটি টাকা আত্মসাত
স্বপদে বহাল শহিদুল



অপরাধচিত্র প্রতিবেদক : কাউকে ধান-চালের ব্যবসায় অংশীদার করার আশ্বাস, কাউকে খাদ্য সরবরাহের ব্যবসায় বিনিয়োগের প্রস্তাব। বিশ্বাস অর্জনে ব্যবহার করতেন সরকারি খাদ্য বিভাগে চাকরির পরিচয়। টাকা নেওয়ার সময় কখনো ব্যাংকের চেক, কখনো স্ট্যাম্পে লিখিত অঙ্গীকারনামা। কিন্তু পাওনা ফেরতের সময় শুরু হয় টালবাহানা। পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় ব্যাংকে জমা দেওয়া একাধিক চেকও ফেরত আসে। এমন অভিযোগ উঠেছে বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের হিসাবরক্ষক শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

বগুড়া ও গাইবান্ধার একাধিক ব্যক্তির দাবি, ব্যবসায় লাভের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ নিয়েছেন শহিদুল। টাকা ফেরত না পেয়ে কেউ মামলা করেছেন, কেউবা পাওনা আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অভিযোগের ঘটনাগুলোতে নতুন করে আলোচনায় এসেছে সরকারি চাকরিতে তার অবস্থান। চেক ডিজঅনারের তিন মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানার পর ২০২৪ সালের ২৮ নভেম্বর নিজ কর্মস্থল থেকে গ্রেফতার হন শহিদুল। পরে জামিনে মুক্তি পান। একপর্যায়ে সাময়িক বরখাস্ত হলেও চলতি বছরের নভেম্বরে আবারও বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে যোগ দিয়েছেন তিনি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গাইবান্ধা সদর উপজেলার খামার পীরগাছা এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে শহিদুল ইসলাম ২০১৪ সালে গাইবান্ধা জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে অফিস সহায়ক হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন। পরে পদোন্নতি পেয়ে অডিটর হন। লালমনিরহাট ও গাইবান্ধায় দায়িত্ব পালনের পর ২০২২ সালে হিসাবরক্ষক পদে পদোন্নতি পান। এরপর বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে যোগ দেন।

অভিযোগকারীদের ভাষ্য, খাদ্য বিভাগে চাকরির সূত্রে ধান-চাল বেচাকেনা ও সরবরাহ ব্যবস্থা বিষয়ে জানাশোনা থাকার কথা বলে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলেন শহিদুল। ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়ার আশ্বাসও দিতেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিনিয়োগের বিপরীতে নিয়মিত লাভ ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূলধন ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো। টাকা নেওয়ার ক্ষেত্রে চেক ও লিখিত অঙ্গীকারনামা ব্যবহার করায় অনেকে তার ওপর আস্থা রাখেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্থ ফেরত না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা।

বগুড়ার শ্যামলী হোটেলের ব্যবস্থাপক জামিল খানের অভিযোগ, ২০২৫ সালে খাদ্য ব্যবসায় বিনিয়োগের কথা বলে তার কাছ থেকে ১২ লাখ ৯০ হাজার টাকা নেন শহিদুল। টাকা নেওয়ার সময় নিরাপত্তা হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের গাইবান্ধা শাখার নিজের হিসাবের দুটি চেক দেন। চেক দুটিতে মোট আট লাখ ৯৬ হাজার টাকা উল্লেখ ছিল। তবে ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় চেকগুলো ডিজঅনার হয় বলে দাবি জামিলের। পরে ২০২৫ সালে আদালতে মামলা করেন তিনি।

জামিল খান বলেন, 'শহিদুল আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। শুধু আমার সঙ্গেই নয়, আরও অনেকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। দীর্ঘদিন তার কোনো খোঁজ পাইনি। এখন শুনছি আবারও বগুড়া জেলা খাদ্য অফিসে যোগ দিয়েছেন। এত অভিযোগের পরও তিনি কীভাবে সরকারি চাকরি করছেন, বুঝতে পারছি না।'

গাইবান্ধার নীলা বেগমের অভিযোগ, মাসে লাভ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে তার কাছ থেকেও ১১ লাখ টাকা নেন শহিদুল। জনতা ব্যাংকের চেকের মাধ্যমে তাকে ওই অর্থ দেন। পাঁচ মাস পর লাভসহ টাকা ফেরতের কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ে অর্থ পাননি। পরে শহিদুল নিজের ব্যাংক হিসাবের একটি চেক দেন। সেটি ভাঙাতে গিয়ে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকার বিষয়টি জানতে পারেন নীলা। এরপর থেকে পাওনা আদায় নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন।

আরেক অভিযোগকারী কামরুল হাসান জানান, পূর্বপরিচয়ের সূত্র ধরে ২০২১ সালের ২১ আগস্ট ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা করে শহিদুলকে সাত লাখ ৫০ হাজার টাকা দেন। দীর্ঘদিন টাকা ফেরত না দেওয়ায় ২০২৩ সালের ২১ মে তাকে দুটি চেক দেওয়া হয়। এর মধ্যে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের একটি চেকে তিন লাখ এবং জনতা ব্যাংকের অপর চেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা উল্লেখ ছিল।

কামরুলের দাবি, ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর দুটি চেকই ডিজঅনার হয়। পরে তিনি আদালতে মামলা করেন। ওই মামলায় শহিদুলকে পুলিশ গ্রেফতারও করেছিল।

ব্যবসায়ী বিপু মিয়ার অভিযোগ, ২০২১ সালে কয়েক দিনের জন্য তার কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা ধার নেন শহিদুল। পরে তিন লাখ টাকা ফেরত দিলেও বাকি দুই লাখ টাকা এখনো পরিশোধ করেননি।

এছাড়া আরও অনেকের কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ থাকলেও তারা পরিচয় প্রকাশ করতে চাননি। তাদের দাবি, সবমিলিয়ে লেনদেনের পরিমাণ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

ভুক্তভোগীদের কয়েকজন জানান, কেউ সঞ্চয়ের টাকা, আবার কেউ ধারদেনা করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছিলেন। প্রতিশ্রুত লাভ তো দূরের কথা, মূলধন ফেরত না পাওয়ায় তারা আর্থিক সংকটে পড়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গাইবান্ধায় চেক ডিজঅনারের তিনটি মামলায় শহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল। এর ভিত্তিতে ২০২৪ সালের ২৮ নভেম্বর বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। একদিন কারাগারে থাকার পর জামিনে মুক্তি পান তিনি। পরে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

অভিযোগকারীরা জানান, ২০২৬ সালের নভেম্বরে পুনরায় বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে যোগ দিয়েছেন শহিদুল। তবে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহারের কারণ, বিভাগীয় তদন্তের ফল এবং সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর সর্বশেষ অবস্থা খাদ্য বিভাগের কাছে জানতে চাওয়া হলেও তারা তথ্য দেয়নি।

অভিযোগের বিষয়ে শহিদুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সব অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা। উল্টো আমিই তাদের কাছে টাকা পাই। যারা আমার কাছে টাকা পেতেন, জমি বিক্রি করে তাদের টাকা পরিশোধ করেছি। আর জেল খেটেছি পূর্বশত্রুতার মামলায়। এসব ঘটনার সঙ্গে জেলখাটার কোনো সম্পর্ক নেই।'

এ বিষয়ে বগুড়া জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নাজমুল হক ভূইয়া বলেন, 'আমি বগুড়ায় নতুন যোগদান করেছি। শহিদুলের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগের বিষয়টি আমার জানা নেই।'

তিনি আরও বলেন, 'তার সঙ্গে কারও ব্যক্তিগত লেনদেন থাকলে সেটি আমাদের দেখার বিষয় নয়। তবে দাপ্তরিক কোনো কাজের জন্য কারও কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'



শেখ হাসিনা ফিরবেন! নাকি ফিরবেন না?

আলমগীর হোসেন : বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে ২০২৪ সালে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলন এক পর্যায়ে এক দফার সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নেয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এক দফা দাবির মুখে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট ২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা।

এ দিন দুপুর আড়াইটার দিকে বঙ্গভবন থেকেই শেখ হাসিনা একটি সামরিক হেলিকপ্টারে করে ভারতের উদ্দেশে বাংলাদেশ ছাড়েন। তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানাও সঙ্গে ছিলেন। ভারতে থেকেই শেখ হাসিনা একের পর এক অডিও বার্তা দিতে থাকলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনূস ভারতের কাছে শেখ হাসিনার কথাবার্তা নিয়ে আপত্তি তোলেন।

ইতিমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে ভরতকে একাধিকবার চিঠিও দিয়েছে। ভারত বরাবরই ভেবে দেখছি, এটি আইনি প্রক্রিয়া– এমন বক্তব্যে দায় সারছে।

বিষয়টি কঠিন রূপ ধারন করে এবছর ৫ আগস্ট নয়াদিল্লিতে ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অব সাউথ এশিয়া (এফসিসি সাউথ এশিয়া) আয়োজিত এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে তিনি ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও বাংলাদেশে ফেরার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেন।

টানাপোড়েন যখন চূড়ান্ত রূপ নেয় তখন ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান, তিনি দ্রুতই বাংলাদেশে ফিরবেন এবং 'মাথা উঁচু করে'। বাংলাদেশ এর বিপরীতে কঠিন বার্তা দেয় ভারতেকে। এরপরও অচলাবস্থা কাটে না।

সর্বশেষ এ বছরের ডিসেম্বরে ফিরবেন বলে জানালে টান টান উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তিনি কি ফিরন নাকি ফিরবে না– এনিয়ে চায়ের টেবিল থেকে সংসদেও ব্যাপক আলোচনা চলে। এরই মাঝে ভারতে বাংলাদেশ দূতাবাসে পাসপোর্ট এক আবেদনের প্রেক্ষিতে দেশের রাজনীতিতে উত্তাপ ছড়াতে থাকে। অনেকেই এই আবেদনকে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজি বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। উত্তপ্ত এই পরিস্থিতিতে বিবিসি বাংলার এক প্রতিবেদনে নতুন করে আলোচনার ডালাপালা মেলছে।

বিবিসি'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে শেখ হাসিনা ভারতে এসে আশ্রয় নিয়ে রয়েছেন, তাও সোয়া দু'বছরের ওপর হলো।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশের আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে - এবং কয়েকমাস আগে তিনি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তিনি চলতি বছরের ডিসেম্বরেই দেশে ফিরবেন। আজ পর্যন্ত তিনি সেই ঘোষণাতেই অনড় আছেন, যদিও দেশে ফেরার কোনো নির্দিষ্ট দিনতারিখ এখনো জানাননি।

শেখ হাসিনার এই দেশে ফেরার ঘোষণা নিয়ে এই মুহূর্তে তার 'হোস্ট কান্ট্রি' যারা, সেই ভারত সরকারও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি।

পাশাপাশি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধও প্রায় দু'বছর হতে চললো তারা ঝুলিয়ে রেখেছে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখপাত্র বারেবারেই বলেছেন, এটি একটি আইনগত বিষয় এবং আইনগতভাবেই এর মীমাংসা করা হবে।

কিন্তু শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা নিয়ে ভারত আসলে কী ভাবছে? এই ঘোষণার নেপথ্যে দিল্লিরও কি কোনও ভূমিকা আছে? এই 'প্রত্যাবর্তনে'র পথ প্রশস্ত করতে ভারত কি পর্দার আড়ালে কোনও তৎপরতা দেখাচ্ছে?

দিল্লি পুরো বিষয়টি এবং এই সংক্রান্ত নানা দিক কীভাবে দেখছে, সেই প্রশ্নগুলোরই উত্তর খোঁজা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

শেখ হাসিনার ঘোষণার সঙ্গে ভারতের যোগ কতটা? : সহজ উত্তর হলো, ভারতের প্রচ্ছন্ন সম্মতি বা অনুমোদন ছাড়া শেখ হাসিনা নিজে থেকে এই ঘোষণা করেননি।

অন্যভাবে বললে, শেখ হাসিনা ও দিল্লি দু'পক্ষই এই ব্যাপারে একমত হয়েছে বলেই এই ঘোষণা এসেছে।

দিল্লিতে শেখ হাসিনার উপস্থিতি যে ভারত সরকারের জন্য ক্রমশ বিব্রতকর একটা ইস্যু হয়ে উঠেছে, এটা কোনও গোপন বিষয় নয়। শুধু ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতকে শুনতে হচ্ছে যে গণহত্যায় অভিযুক্ত একজন দণ্ডিত অপরাধীকে তারা দিনের পর দিন আশ্রয় দিয়ে রেখেছে।

ভারতের জন্য সম্ভবত সবচেয়ে ভাল সমাধান হতো যদি তিনি তৃতীয় কোনও দেশে চলে যেতে পারতেন। কিন্তু অতীতে বারবার নানা দেশের সঙ্গে দিল্লির এ নিয়ে কথাবার্তা হলেও নানা কারণে সেই চেষ্টা সফল হয়নি।

ফলে ভারত এখন মনে করছে, শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা এবং সে দেশে বিচারের মুখোমুখি হওয়াটাই একমাত্র বাস্তবসম্মত অপশন।

বাংলাদেশে ভারতের দীর্ঘদিনের মিত্র আওয়ামী

লীগকে রাজনৈতিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করতেও শেখ হাসিনার নিজের সে দেশে ফেরা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই– সেটা নিয়েও দিল্লিতে নীতি-নির্ধারকরা একমত।

ভারতে আশ্রয় পাওয়া বিদেশি অতিথিদের জন্য সরকার নিয়মিত ডিব্রিফিং-এর আয়োজন করে থাকে। শেখ হাসিনাও তার ব্যতিক্রম নন এবং এই সেসনগুলোতে তাকে ভারতের এই মনোভাবের কথা তুলেও ধরা হয়েছিল।

দু'পক্ষ বিষয়টি নিয়ে সহমত হওয়ার পরেই শেখ হাসিনা ডিসেম্বরে দেশে ফেরার ইচ্ছার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন।

প্রত্যর্পণের অনুরোধ তাহলে ঝুলিয়ে রাখা কেন?

শেখ হাসিনাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার 'নোট ভার্বাল' বা কূটনৈতিক বার্তার মাধ্যমে ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছিল ২০২৪-এর ডিসেম্বরেই। এরপর একাধিকবার সেই মর্মে তাগাদাও দেওয়া হয়েছে।

ভারত আজ পর্যন্ত সেই অনুরোধে কোনও সাড়া দেয়নি– হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি। কিন্তু ভারত যদি সত্যিই চায় শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরুন, তাহলে সে অনুরোধ মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়?

এর উত্তরে ভারতের পর্যবেক্ষকরা বলছেন, শেখ হাসিনা ভারতের দীর্ঘদিনের আস্থাভাজন ও পরীক্ষিত বিদেশি বন্ধু, তাকে এভাবে বন্দি হিসেবে বাংলাদেশের বিমানে তুলে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, অতীতে 'হাতকড়া পড়িয়েও' বিদেশ থেকে বন্দিদের ফেরত পাঠানোর নজির আছে।

কিন্তু শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে ভারত সেরকম কিছু করবে– তা কল্পনারও অতীত।

যদি সেটা করা হয়– তাহলে বিদেশে ভারতের মিত্র রাজনীতিকদের কাছে ভুল বার্তা যাবে। যেমন নেপালে, শ্রীলংকায় বা মালদ্বীপে কোনও নেতাই ভারতকে আর কখনো ভরসা করতে পারবেন না।

তা ছাড়া শেখ হাসিনা যখন ২০২৪-র ৫ই অগাস্ট ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেন, তিনি আদালতে দণ্ডিত অপরাধী ছিলেন না, ছিলেন প্রতিবেশী দেশের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী। ভারতের চোখে তার সেই 'স্ট্যাটাসে' কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তিতে এমন অনেক আইনি ফাঁকফোকর আছে, যা কাজে লাগিয়ে কোনও অনুরোধ দিনের পর দিন ফেলে রাখা সম্ভব। বাংলাদেশের অনুরোধ নিয়েও ভারতও ঠিক সেরকম কিছুই করছে।

তাহলে ভারত কী চায়, কোন শর্তে শেখ হাসিনা ফিরবেন?

দিল্লিতে সরকারি কর্মকর্তারা বিবিসিকে আভাস দিয়েছেন, শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরার জন্য ভারতের প্রধান শর্ত মূলত দুটো।

প্রথমত, শেখ হাসিনা ভারতে এসে নেমেছিলেন বাংলাদেশ মিলিটারির সামরিক এয়ারক্র্যাফটে– তাকে ফিরিয়ে নিতে হলে সেই কাজটাও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকেই করতে হবে।

সেই প্রক্রিয়াটা আকাশপথেও হতে পারে, কিংবা স্থলপথে। মানে বাংলাদেশ একটি সামরিক বিমান পাঠিয়ে তাকে দিল্লি থেকে নিয়ে যেতে পারে, আবার স্থল সীমান্তের কোনও পয়েন্টে এসেও সে দেশের সেনাবাহিনী তাকে গ্রহণ করতে পারে।

এর জন্য দিল্লির তরফে যে ধরনের 'লজিস্টিকাল' প্রস্তুতি বা আয়োজন দরকার, ভারত সেটা করার জন্যও তৈরি আছে।

দ্বিতীয় শর্তটা হল, শেখ হাসিনা যাতে তার মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ পান এবং জুলাই গণহত্যার অভিযোগে তার বিচার নতুন করে শুরু করা হয়– বাংলাদেশকে সেই নিশ্চয়তা দিতে হবে।

তবে এই দাবিটা যাতে বাংলাদেশের নিজস্ব বিচার ব্যবস্থায় বিদেশি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখা না হয়, সে ব্যাপারেও ভারত অতি মাত্রায় সতর্ক থাকতে চাইছে এবং প্রকাশ্যে এ নিয়ে কোনও মন্তব্যও করছে না।

দিল্লিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তার কথায়, "আমরা কখনোই জেনেবুঝে তাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য এগিয়ে দিতে পারি না। বরং তিনি যাতে নতুন করে সুষ্ঠু বিচারের সুযোগ পান, সেটাই নিশ্চিত করতে চাইব।"

সেই বিচার যাতে আন্তর্জাতিক বিশ্বের ও গ্লোবাল মিডিয়ার নজরদারিতে হয়, সেটাও ভারত নিশ্চিত করতে চাইবে বলে তিনি জানাচ্ছেন।

এই দুটো শর্ত পূরণ করে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার পথ যাতে প্রশস্ত করা যায়, সেই লক্ষ্যে দিল্লি বেশ কয়েক মাস ধরেই ঢাকার সঙ্গে পর্দার আড়ালে আলোচনাও চালাচ্ছে।

দুই দেশের সেনাবাহিনীর ভূমিকা এখানে কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত দীনেশ ত্রিবেদী যখন কিছুটা আকস্মিকভাবে এক অনির্ধারিত সফরে দিল্লিতে আসেন, তখন প্রধানমন্ত্রী মোদী ছাড়াও তিনি দেখা করেছিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরাজ শেঠের সঙ্গেও।

ভারতের একটি শীর্ষ সামরিক সূত্র তখন বিবিসিকে বলেন, "বাংলাদেশে আমাদের হাই কমিশনারের দিল্লিতে এসে আর্মি চিফের সঙ্গে দেখা করার এমনিতে কোনও কারণই নেই, যদি না বিশেষ কোনো পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনো কারণ থাকে।"

তিনি আভাস দিয়েছিলেন, সেই কারণটা আর কিছুই নয়, শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীরও একটা সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা।

বস্তুত গত দু-আড়াই বছরে ঢাকা ও দিল্লির দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে যতই ওঠাপড়া থাক, দুই দেশের সেনাবাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ থেকেছে এবং তাতে কখনোই কোনও ছেদ পড়েনি।

ভারতে ঠিক এর আগের সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে ও তার পূর্বসূরীরাও একাধিকবার প্রকাশ্যে জানিয়েছেন, "চব্বিশের জুলাইয়ের আগে থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামানের সঙ্গে তাদের প্রতি সপ্তাহে কথা হয় এবং হয়ে এসেছে"।

দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে এই সহজ, স্বাভাবিক সম্পর্কটা শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো হোক, এটাই আসলে ভারত চাইছে বলে ওই সূত্রটি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

তিনি তখন বলেছিলেন, "দেশে ফিরে গেলে শেখ হাসিনার সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়বে না, এটাও তো ভারত নিশ্চিত করতে চাইবে। কারণ চাই বা না চাই, এই দায়িত্ব এই মুহূর্তে ভারতের কাঁধেই এসে পড়েছে।"

ফলে বাংলাদেশে ফিরে গেলে শেখ হাসিনার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ভার সে দেশের সেনাবাহিনীই নিক, এটাও ভারত চাইছে।

ডিসেম্বরে শেখ হাসিনা কী আদৌ ফিরতে পারবেন, ভারত কী ভাবছে?

এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া এই মুহূর্তে খুব কঠিন– তবে ভারত মনে করছে শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা অন্য জায়গায়।

দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা এই প্রতিবেদককে বলেছেন, তাদের ধারণা মুখে যতই বাংলাদেশ শেখ হাসিনাকে ফেরত চাক, আসলে ঢাকা মোটেই চায় না সাবেক প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে ফিরুন।

গোটা বিষয়টায় ভারতের কূটনৈতিক লাভ-ক্ষতির অঙ্কটা কী?

বাস্তবতা হল, ভারত যেভাবে চাইছে সেভাবে শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরানো কঠিন, এটা প্রথম দিন থেকেই দিল্লির জানা ছিল। তারপরেও শেখ হাসিনা দেশে ফেরার ঘোষণা করেছেন, আর সেটা দিল্লির সায় নিয়েই করেছেন।

এর কারণ হলো, দিল্লি মনে করছে যদি তিনি শেষ পর্যন্ত এখন নাও ফিরতে পারেন– তাতেও ভারতের সেই অর্থে হারানোর কিছু নেই।

"আমরা এটুকু তো তখন বলতেই পারব, শেখ হাসিনা নিজে থেকে ফিরতেই চেয়েছিলেন– কিন্তু বাংলাদেশ নানা অজুহাত দিয়েছে বলেই সেটা সম্ভব হয়নি," বলছেন দিল্লিতে সাউথ ব্লকের এক কর্মকর্তা।

পাশাপাশি শেখ হাসিনার ফেরার ঘোষণায় বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরাও অনেক উজ্জীবিত বোধ করছেন, সেটাও বলাই বাহুল্য।

ভারত যেহেতু চায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপে আওয়ামী লীগের প্রত্যাবর্তন ঘটুক, ফলে শেখ হাসিনার ফেরার ঘোষণার সেটাও একটা ইতিবাচক দিক বলে দিল্লি মনে করছে।

এই বছরের ৩১শে ডিসেম্বর শেখ হাসিনা কোথায় থাকবেন তা বলা কঠিন– কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি তিনি ভারতের মাটিতেই থেকে যান, তার উপস্থিতিকে 'জাস্টিফাই' করার জন্য তাদের হাতে তখন বাড়তি যুক্তি থাকবে বলে দিল্লি মনে করছে।

দলিল আটকে অর্থ আদায় : ১৭ সেবায় ভোগান্তির ফাঁদ

চকরিয়া সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে ঘুসের রাজা সালাহউদ্দিন



অপরাধচিত্র প্রতিনিধি: কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে জমির দলিল নিবন্ধনসহ বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে সরকারি ফির বাইরে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। দলিলের সামান্য বানান ভুল, খতিয়ানের তথ্যের অসংগতি, মামলার অজুহাত, নকল উত্তোলন, বণ্টননামা, হেবা ও কমিশন দলিল নিবন্ধন–প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সেবাকে ঘিরে ঘুষ দাবির অভিযোগ করছেন ভুক্তভোগীরা।

অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন চকরিয়া উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার সালাহউদ্দিন এবং কার্যালয়ের অফিস সহকারী অর্চনা বড়ুয়া। অভিযোগ রয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলিল নিবন্ধন আটকে রেখে পরে অর্থের বিনিময়ে একই দলিল নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা হয়। আবার নির্ধারিত সরকারি ফি পরিশোধের পরও দলিলপ্রতি অতিরিক্ত টাকা দিতে হয় বলে দাবি করেছেন একাধিক সেবাগ্রহীতা ও দলিল লেখক।

১০ হাজার টাকা দেওয়ার পর জমি নিবন্ধনের অভিযোগ : কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের পরিবেশবাদী ও প্রবীণ সাংবাদিক ফরিদুল আলম শাহিনের এক আত্মীয়ের জমি কেনার ঘটনা ঘিরে নতুন করে আলোচনায় এসেছে চকরিয়া সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সেবা কার্যক্রম।

অভিযোগ অনুযায়ী, জমি নিবন্ধনের জন্য কার্যালয়ে গেলে জমিদাতার খতিয়ানে নাল জমির পরিবর্তে বাড়ির দাগসংক্রান্ত তথ্য থাকায় নিবন্ধন প্রক্রিয়া আটকে দেওয়া হয়। পরে ওই ত্রুটির বিষয়টি নিষ্পত্তির নামে জমিদাতার কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা নেওয়ার পর দলিল নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

সামান্য তথ্যগত অসংগতির কারণে নিবন্ধন আটকে দেওয়া এবং পরে অর্থের বিনিময়ে একই দলিল নিবন্ধনের অভিযোগ প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও সেবার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

১৭ ধরনের সেবায় হয়রানির অভিযোগ : এই কার্যালয়ের অনিয়ম ও অর্থ আদায়ের অভিযোগ নিয়ে গত দুই মাস ধরে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। অনুসন্ধানে সচেতন মহল, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, দলিল লেখক, কার্যালয়ের কর্মচারী ও স্থানীয় ভুক্তভোগীসহ অন্তত ৩০ জনের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।

তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, দলিল যাচাই-বাছাই, নকল উত্তোলন, জাল দলিল ও খতিয়ানসংক্রান্ত বিষয়, দলিল নিবন্ধন অনুমোদনসহ বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতাদের নানা জটিলতায় পড়তে হয়।

দলিলের দাতা-গ্রহীতার নামের সামান্য বানান ভুল, নামের সঙ্গে 'প্রকাশ' বা 'ওরফে' শব্দ যুক্ত থাকা, সম্পত্তির বিবরণে ছোটখাটো অসংগতি কিংবা অন্যান্য প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে দলিল আটকে রাখার অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যয়নপত্র দিয়ে নিবন্ধন না করার কথা জানানো হলেও পরবর্তী সময়ে অর্থের বিনিময়ে একই দলিল নিবন্ধন করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

দলিলপ্রতি ৫০০ থেকে ১ হাজার টাকা, কমিশন দলিলে ৫০ হাজার পর্যন্ত দাবির অভিযোগ : ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, পৌর এলাকার মধ্যে প্রতিটি দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সরকারি ফির বাইরে ৫০০ টাকা এবং পৌর এলাকার বাইরে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়।

কমিশনের মাধ্যমে দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রেও নির্ধারিত নিয়মের বাইরে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করার অভিযোগ রয়েছে। চট্টগ্রামে কমিশন দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন কয়েকজন দলিল লেখক ও সেবাগ্রহীতা।

অফিস সহকারী অর্চনা বড়ুয়ার বিরুদ্ধেও কমিশন দলিলের কাজে ১০ হাজার টাকার কম গ্রহণ না করা এবং টাকা নিয়ে সেবাগ্রহীতাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের অভিযোগ করেছেন কয়েকজন। অভিযোগ রয়েছে, কমিশনের কাজে গেলে তাঁর যাতায়াতের জন্য আলাদা গাড়ির ব্যবস্থাও করতে হয়।

মামলার অজুহাতে ৩ হাজার থেকে ২০

হাজার টাকা আদায়ের অভিযোগ : একাধিক ভুক্তভোগীর অভিযোগ, কোনো খতিয়ানে কার্যকর নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও সংশ্লিষ্ট জমির বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে–এমন অজুহাতে দলিল নিবন্ধন আটকে রাখা হয়। পরে বিষয়টি নিষ্পত্তির নামে দলিলপ্রতি ৩ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত দাবি করা হয়।

বিলম্বিত উপস্থিতি ও 'লেইট ফি' আদায়ের অভিযোগ : অফিসের নির্ধারিত সময় সকাল ১০টা হলেও সাব-রেজিস্ট্রার সালাহউদ্দিন নিয়মিত সময়মতো কার্যালয়ে উপস্থিত হন না বলে অভিযোগ করেছেন সেবাগ্রহীতা ও দলিল লেখকদের একাংশ।

তাদের দাবি, তিনি প্রায়ই দুপুর ১২টার দিকে অফিসে আসেন এবং এজলাসে বসেন দুপুর ২টার পর। এতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় থাকতে হয় সেবাগ্রহীতাদের। অভিযোগ রয়েছে, দুপুর আড়াইটার পর দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রে অফিস সহকারী অর্চনা বড়ুয়া দলিলপ্রতি ৩ হাজার থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেন।

তবে এ ধরনের অর্থ আদায়ের কোনো সরকারি বিধান রয়েছে কি না, তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে ব্যাখ্যা চাইলে কোন উত্তর দিতে রাজি হয়নী তার।

পাওয়ার অব অ্যাটর্নি, হেবা ও বণ্টননামা দলিলেও বাড়তি অর্থের অভিযোগ : পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে জমি বিক্রির ক্ষেত্রে দলিলের মূল্যের ৫ শতাংশ পর্যন্ত নগদ অর্থ কার্যালয়ে দিতে হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। হেবা দলিলের ক্ষেত্রে দলিলপ্রতি অতিরিক্ত ২ হাজার টাকা এবং জমির প্রতি শতকে ২০০ টাকা আদায়ের অভিযোগও করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

এ ছাড়া কক্সবাজার জেলা রেজিস্ট্রারের নামে দলিলপ্রতি ৪০০ টাকা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। যদিও জেলা রেজিস্ট্রারের নামে অর্থ আদায়ের বিষয়ে কোনো লিখিত নির্দেশনা বা সরকারি হিসাব পাওয়া যায়নি বলে অনুসন্ধানে এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বণ্টননামা দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রেও সাব-রেজিস্ট্রারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ ও সমঝোতা না করলে কাজ হয় না বলে অভিযোগ করেছেন কয়েকজন দলিল লেখক। তাদের দাবি, এ ধরনের দলিল নিবন্ধনের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত অর্থের চাপ সৃষ্টি করা হয়।

দলিল লেখকের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা, অফিসে উত্তেজনা : সম্প্রতি দলিল লেখক সমিতির সাবেক সভাপতি সাইফুল আজম একটি দলিল নিবন্ধন করতে গিয়ে অফিস সহকারী ও সাব-রেজিস্ট্রারের সঙ্গে ঘুষের অর্থ নিয়ে বাগ্‌ বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বলে একাধিক ব্যক্তি জানিয়েছেন।

তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে কার্যালয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। উপস্থিত সেবাগ্রহীতা ও কর্মচারীরা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। পরে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় সচেতন মহলে আলোচনা শুরু হয়।

অভিযোগ রয়েছে, ঘটনাটির পর দলিল লেখকের বিরুদ্ধে কোনো আনুষ্ঠানিক আইনগত ব্যবস্থা না নিয়ে বিষয়টি আপসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ ও উভয় পক্ষের বক্তব্য ঘুষ লেনদেনের বিষয়টি সামনে আসে।

কর্মস্থলে অবস্থান না করে চট্টগ্রামে বসবাসের অভিযোগ : একাধিক দলিল লেখকের অভিযোগ, সাব-রেজিস্ট্রার সালাহউদ্দিন সপ্তাহের পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে নিয়মিত সব দিন কার্যালয়ে উপস্থিত থাকেন না। বিশেষ করে রবিবার ও বৃহস্পতিবার তাঁর অনুপস্থিতির অভিযোগ রয়েছে। তাঁকে নিজ কর্মস্থল চকরিয়ায় না থেকে প্রায় ৯৮ কিলোমিটার দূরে চট্টগ্রামে বসবাস করে সপ্তাহে তিন দিন অফিস করতে দেখা যায় বলে দাবি করেছেন তাঁরা।

সরকারি কর্মকর্তার কর্মস্থলে অবস্থান, উপস্থিতি ও দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদন্ত প্রয়োজন বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

দলিল পুড়িয়ে ফেলার ঘটনাতেও প্রশ্ন উঠেছিল : চকরিয়া সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয় নিয়ে এর আগে আরও একটি ঘটনা আলোচনায় আসে। ২০২৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত দাবিদারবিহীন হিসেবে চিহ্নিত প্রায় ৩ হাজার ২০০টি দলিল পুড়িয়ে ফেলার ঘটনা নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ সময় সাব-রেজিস্ট্রার সালাহউদ্দিনের উপস্থিতির কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল।

দলিলগুলো কী প্রক্রিয়ায় দাবিদারবিহীন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যথাযথ অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল কি না এবং ডিজিটাল বা অন্য নিরাপদ পদ্ধতিতে সংরক্ষণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন পুড়িয়ে ফেলা হলো–এসব প্রশ্নও আলোচনায় আসে।

এ ঘটনায় একজন দলিলগ্রহীতা মোহাম্মদ আলম সংবাদ সম্মেলন করে নিজের দলিলের বিষয়ে অভিযোগ তোলেন বলে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয়। তবে দলিল পোড়ানোর ঘটনা এবং বর্তমান ঘুষ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

রাজস্ব আদায় ও সেবার হিসাব প্রকাশের দাবি: দলিল লেখক ও স্থানীয়দের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জুলাই থেকে ২০২৬ সালের মে পর্যন্ত ১১ মাসে চকরিয়া সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে বিপুলসংখ্যক দলিল নিবন্ধন হয়েছে। এসব দলিল থেকে সরকার কত টাকা রাজস্ব পেয়েছে, কত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে এবং প্রতিদিন গড়ে কতটি দলিল নিবন্ধন হয়েছে–তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন সচেতন মহল।

এ বিষয়ে নিবন্ধন অধিদপ্তর ও জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের মাধ্যমে দলিল নিবন্ধনের সংখ্যা, সরকারি রাজস্ব, ফি আদায় এবং কর্মচারীদের দায়িত্বসংক্রান্ত নথি যাচায়ের জন্য যোগা যোগ করা হলে কোন সারা পাওয়া যায়নী।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য : অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে চকরিয়া সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের অফিস সহকারী অর্চনা বড়ুয়া বলেন, জেলা সাবরেজিস্ট্রারের অনুমতি ছারা বক্তব্য দেওয়া যাবেনা বলে যানায় তবে ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ তো আপনার বিরুদ্ধে বক্তব্য তো আপনি দিবেন একথা বলাতে ফোনের সংযোগ কেটে দেয়।

সাব-রেজিস্ট্রার সালাহউদ্দিন বলেন, জেলা অফিসে গিয়ে বক্তব্য নিন।

কক্সবাজার জেলা রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ রেজাউল করিম বকী অভিযোগের বিষয়ে বলেন, "অভিযোগের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি : সাব-রেজিস্ট্রার কার্যালয় জমির মালিকানা হস্তান্তর ও নাগরিকের সম্পত্তির অধিকার সংরক্ষণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সেখানে সেবা নিতে গিয়ে যদি সাধারণ মানুষকে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়, দলিল আটকে রেখে হয়রানি করা হয় কিংবা সরকারি ফির বাইরে অর্থ আদায় করা হয়, তাহলে তা শুধু দুর্নীতির অভিযোগ নয়, নাগরিকের মৌলিক সেবা পাওয়ার অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

তাই অভিযোগগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত, সরকারি ফি-সংক্রান্ত তালিকা প্রকাশ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি যাচাই, দলিল নিবন্ধনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ এবং অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগী ও সচেতন মহল।



থামছে না মানবপাচার

মালয়েশিয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে পাহাড়ে বন্দিশালা : জিম্মিদের ঘিরে ভারী অস্ত্রধারী

জাফর আলম (কক্সবাজার ব্যুরো) : কক্সবাজারের উখিয়া-টেকনাফ সীমান্তে সক্রিয় হয়ে উঠেছে মানবপাচারকারী চক্র। সাগরপথে মালয়েশিয়া পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষজন সংগ্রহ করছে তারা। এরপর দুর্গম পাহাড়ের আস্তানায় আটকে রেখে অস্ত্রের মুখে জিম্মি, শারীরিক নির্যাতন ও মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা ঘটছে। ভুক্তভোগীদের ভাষ্য, এসব আস্তানায় ভারী অস্ত্র নিয়ে সক্রিয় রয়েছে মিয়ানমারের সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্যরাও। গত ৫ নভেম্বর বৃহস্পতিবার টেকনাফের পাহাড়ি এলাকায় মানবপাচারকারীদের আস্তানায় যৌথ বাহিনীর অভিযানের সময় গোলাগুলিতে এক সেনাসদস্য নিহত হন। অভিযানে ৬ রোহিঙ্গাসহ ৫৬ জনকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের বর্ণনায় উঠে আসে কীভাবে মালয়েশিয়া যাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের অপহরণ করে পাহাড়ের বন্দিশালায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে চালানো হতো নির্যাতন, দাবি করা হতো লাখ লাখ টাকা মুক্তিপণ। উদ্ধার হওয়া কয়েকজনের দাবি, এসব আস্তানায় ৪০টিরও বেশি ভারী অস্ত্র রয়েছে। চক্রের সদস্যদের বড় একটি অংশ মিয়ানমারের নাগরিক। উদ্ধার হওয়া ফরিদপুরের শান্তা উপজেলার কলাগাছিয়া গ্রামের এসএম আসাদুজ্জামান জানান, কক্সবাজারে কাজ করার সুবাদে তিনজন রোহিঙ্গার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। পরে তারা তাকে টেকনাফের পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে গিয়ে ১০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেয়া হয়। এরপর পরিবারের কাছে দুই লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। উদ্ধার হওয়া কয়েকজনের অভিযোগ, অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নিয়মিত নির্যাতন করা হতো। এমনকি নামাজ আদায় করতে গেলেও নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যেত। তাদের দাবি, আস্তানায় প্রায় ৪০ জন সশস্ত্র সদস্য ছিল। কেফাইয়্যা নামের এক দালালসহ আরও পাঁচ-ছয়জন এই চক্রের সঙ্গে জড়িত। অপরিচিত পাহাড়ি এলাকায় চোখ বেঁধে অস্ত্রের মুখে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ও মানবপাচারের ঘটনায় দীর্ঘদিন ধরেই অস্থির উখিয়া-টেকনাফ। স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি রোহিঙ্গারাও এসব অপরাধী চক্রের ঝুঁকিতে রয়েছেন। একদিকে নিজ দেশে প্রত্যাবাসন অনিশ্চিত, অন্যদিকে বন্দিশিবিরের জীবন নিয়ে হতাশা-এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাচ্ছে পাচারকারীরা।

মানবপাচার চক্র নির্মূলে ফের যৌথ বাহিনীর অভিযান: টেকনাফের দুর্গম পাহাড়ে মানবপাচার চক্রের আস্তানা ও বন্দিশালা নির্মূলে আবারও সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেছে যৌথ বাহিনী। গত ৭ নভেম্বর শনিবার সকাল থেকে উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের লেদা-রঙ্গীখালীর দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় এ অভিযান শুরু হয়। সেনাবাহিনীর ১০ পদাতিক ডিভিশনের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে সেনাবাহিনী, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও পুলিশের দেড় শতাধিক সদস্য অংশ নেন।

মালয়েশিয়ায় পাচারের সময় নারীসহ ৯ জন উদ্ধার: টেকনাফে সমুদ্রপথে জোরপূর্বক মালয়েশিয়া পাচারের অপচেষ্টা নস্যাৎ করে দিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। অভিযানে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা ৯ জন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে টেকনাফ থানাধীন দক্ষিণ লম্বরীঘাট এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করে টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি)। বিজিবি জানায়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ওই দিন বিকেল ৫টার দিকে কয়েকজন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় পাচারের উদ্দেশ্যে লম্বরীঘাট এলাকায় নিয়ে আসা হচ্ছে। খবর পেয়ে টেকনাফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের দিকনির্দেশনায় বিজিবির একটি বিশেষ টহল দল বিকেল সাড়ে ৫টায় ওই এলাকায় কৌশলগত অবস্থান নেয়। পরে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে টহল দল লম্বরীঘাট এলাকায় ২০-২৫ জন ব্যক্তিকে অবস্থান করতে দেখে। এ সময় সমুদ্র থেকে একটি সন্দেহজনক নৌকা ঘাটের দিকে আসতে দেখে বিজিবি নৌকাটিকে ধাওয়া করে। একপর্যায়ে মানবপাচার চক্রের ১০-১৫ জন সদস্য দ্রুত নৌকায় উঠে সমুদ্রের দিকে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা ৯ জন ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করে বিজিবি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে

উদ্ধারকৃতরা তাদের পাচারের উদ্দেশ্যে ওই স্থানে নিয়ে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। উদ্ধারকৃতরা হলেন -আমির হোসেন (৪৫), মো. জীবন (১৯), জান্নাত আরা (১৭), আব্দুল খালেক (২৯), ফয়সল করিম (১৬), আরিফুল ইসলাম (২১), নুরুল ইসলাম (২২), আহমদ নবী (২৩) এবং জাহিদ আলম (১৮)। এ বিষয়ে টেকনাফ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক বলেন, মানবপাচার ও অন্যান্য সংঘবদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধে বিজিবির অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। সীমান্ত ও উপকূলীয় এলাকায় মানবপাচার প্রতিরোধে বিজিবির গোয়েন্দা তৎপরতা, নজরদারি এবং বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে। উদ্ধারকৃত ৯ জনের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানিয়েছে বিজিবি।

১৫ বছর ধরে ছেলের অপেক্ষায় মা: মানবপাচারের নির্মম পরিণতির সাক্ষী টেকনাফের বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর গ্রামের ৮০ বছরের সুরা খাতুন। ১৫ বছর আগে দালালের মাধ্যমে সাগরপথে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন ছেলে মোহাম্মদ আলী। এরপর আর ফেরেননি।

স্ত্রী ও তিন সন্তান রেখে জীবিকার আশায় বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন মোহাম্মদ আলী। কিন্তু সেই যাত্রাই তার পরিবারের জন্য হয়ে ওঠে অনিশ্চয়তার শুরু। তিনি কোথায় আছেন, বেঁচে আছেন কি না– আজও নিশ্চিত নয় পরিবার। অনেকে ধারণা করছেন, সাগরেই হয়তো তার মৃত্যু হয়েছে। তবুও ছেলের ফেরার অপেক্ষায় আছেন বৃদ্ধা মা।

১৭ জন উদ্ধার, পালিয়ে যায় পাচারকারীরা: গত ২৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় টেকনাফ সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ লম্বরী এলাকায় অভিযান চালিয়ে মালয়েশিয়ায় পাচারের উদ্দেশ্যে আটকে রাখা ১৭ জনকে উদ্ধার করে এসআরবি-১৫। বাহিনীর মিডিয়া কর্মকর্তা আ ম ফারুক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যায়। পরে একটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১৭ জনকে উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা জানান, বিদেশে পাঠানোর কথা বলে তাদের সেখানে জড়ো করা হয়েছিল। পরে তাদের টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

আরেক অভিযানে উদ্ধার ২০: এর আগে ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে বাহারছড়া ইউনিয়নের নোয়াখালীপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৮ জনকে উদ্ধার করে পুলিশ। তাদের মধ্যে ১৬ জন বাংলাদেশি ও দুজন রোহিঙ্গা নাগরিক। একই দিনে বাহারছড়া উপকূলীয় এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে আরও দুই বাংলাদেশিকে উদ্ধার করে কোস্টগার্ড। দুই দফা অভিযানে মোট ৩৭ জন উদ্ধার হলেও কোনো পাচারকারীকে আটক করা সম্ভব হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

টার্গেটে স্থানীয় যুবক, রোহিঙ্গা নারী: অনুসন্ধানে স্থানীয় সূত্রগুলো জানায়, পাচারকারীদের টার্গেটে রয়েছে বেকার যুবক, নিম্নআয়ের মানুষ ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী। উচ্চ বেতনের চাকরি, উন্নত জীবন কিংবা অল্প খরচে বিদেশ যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ফাঁদে ফেলার অভিযোগ রয়েছে।

বিশেষ করে রোহিঙ্গা নারীদের বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর একটি প্রবণতার কথাও জানিয়েছেন উখিয়ার কয়েকজন রোহিঙ্গা মাঝি। সূত্রের দাবি, সম্ভাব্য ভিকটিমের পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ রেখে বিশ্বাস অর্জন করা হয়। এরপর ছোট ছোট দলে ভাগ করে নির্দিষ্ট স্থানে এনে জড়ো করা হয়। সুযোগ বুঝে ছোট নৌযানে করে গভীর সাগরে অপেক্ষমাণ বড় ট্রলারে তুলে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

পাহাড় থেকে সাগর–বদলেছে কৌশল: স্থানীয় সূত্রের দাবি, বাহারছড়ার হাজমপাড়া, মারিশবনিয়া, কচ্ছপিয়া ও নোয়াখালীপাড়া এলাকার দুর্গম পাহাড় ও উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবহার করে বিভিন্ন সময় লোকজনকে জড়ো করা হয়। উখিয়ার মনখালী ও চোয়াংখালীসহ টেকনাফের বিভিন্ন দুর্গম উপকূলীয় এলাকাও পাচারের সম্ভাব্য রুট হিসেবে স্থানীয়দের কাছে পরিচিত।

অভিযোগ রয়েছে, স্থানীয় দালালরা প্রথমে ভিকটিম সংগ্রহ করে। পরে তাদের অন্য দালালদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। শেষপর্যায়ে ট্রলার নিয়ন্ত্রণকারী চক্রের মাধ্যমে গভীর সাগরে পাঠানো হয়।

স্থানীয় সূত্রে অর্ধশতাধিক সদস্যের অভিযোগ: মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ছৈয়দুল হক প্রকাশ লেং ছৈয়দ, আব্দুল আলী, কেফায়েত উল্লাহ, ফেরদৌস, জসীম ও মুজিবসহ বেশ কয়েকজনের নাম স্থানীয় বিভিন্ন সূত্রে উঠে এসেছে। স্থানীয়দের দাবি, এ ধরনের আরও বহু ব্যক্তি বিভিন্ন পর্যায়ে এই নেটওয়ার্কে যুক্ত রয়েছে। তবে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা আদালতের রায় বা সংশ্লিষ্ট মামলার নথি ছাড়া নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। এসব অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্যও যাচাই করা প্রয়োজন। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, কোনো কোনো ব্যক্তি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে আটক হওয়ার পর জামিনে বেরিয়ে ফের একই ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে।

মিয়ানমারে নির্যাতনের অভিযোগ: মানবপাচারের সঙ্গে যুক্ত আরেকটি ভয়াবহ অভিযোগ হলো–ভিকটিমদের জিম্মি করে পরিবারের কাছ থেকে টাকা আদায়। একাধিক সূত্রের দাবি, মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী দুর্গম এলাকায় পাচারকারীদের নিয়ন্ত্রিত কিছু আস্তানা রয়েছে। সেখানে ভিকটিমদের আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য নির্যাতনের অভিযোগও রয়েছে। তবে এসব অভিযোগের স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য যাচাই প্রয়োজন।

বাহারছড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, মানবপাচারের বিরুদ্ধে পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। কক্সবাজার পুলিশ সুপার এএনএম সাজেদুর রহমান বলেন, শীত মৌসুমে মানব পাচারকারীদের তৎপরতা তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মাদক ও মানবপাচারসহ বিভিন্ন অপরাধ দমনে টেকনাফে বিশেষ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। মাদক কিংবা মানব পাচারকারীরা অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা করলে এই ক্যাম্পের মাধ্যমে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবে। পুলিশের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি টেকনাফের অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতেই ক্যাম্পটি স্থাপন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মানব পাচারের পাশাপাশি অনিয়মিত সমুদ্রযাত্রায় প্রাণহানির ঘটনাও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমুদ্রপথে রোহিঙ্গাদের জন্য বছরটি ছিল সবচেয়ে প্রাণঘাতী। ওই বছর ৬ হাজার ৫০১ জন রোহিঙ্গা সমুদ্রপথে মালয়েশিয়া যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে ৮৯২ জনের মৃত্যু বা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া চলতি বছরের ৮ এপ্রিল আন্দামান সাগরে প্রায় ২৮০ যাত্রী নিয়ে একটি ট্রলারডুবির ঘটনায় অন্তত ৩৩ জনকে হত্যার অভিযোগ ওঠে। জুনের শেষ দিকে এবং ৮ জুলাই মিয়ানমার উপকূলে আরও দুটি নৌকাডুবির ঘটনায় পাঁচ শতাধিক মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা করা হয়।বিশেষজ্ঞদের মতে, রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন অনিশ্চয়তা, জীবিকার সংকট, শীত মৌসুমে সমুদ্রযাত্রার অনুকূল পরিবেশ এবং আন্তঃদেশীয় অপরাধী চক্রের তৎপরতা-সব মিলিয়ে মানব পাচারের ঝুঁকি বাড়ছে। তাই সীমান্তে নজরদারি ও অভিযান জোরদারের পাশাপাশি পাচারকারী চক্রের অর্থায়ন, যোগাযোগের নেটওয়ার্ক এবং আন্তর্জাতিক যোগসূত্র শনাক্ত করা জরুরি। একই সঙ্গে ভুক্তভোগীদের নিরাপত্তা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত না হলে এই অপরাধের চক্র ভাঙা কঠিন হবে।

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলায় তথ্যপ্রাপ্তির জটিলতা সৃষ্টি করছেন ইউএনও জনি রায়



অপরাধচিত্র প্রতিনিধিঃ সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য চেয়ে এবার তথ্যের মূল্য নির্ধারণ ও সরবরাহের প্রক্রিয়া নিয়েই গুরুতর প্রশ্নের মুখে পড়েছে সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলা প্রশাসন। তথ্য অধিকার আইনে আবেদন, নির্ধারিত সময় পার, তাগিদপত্র ও আপিলের পর একজন সাংবাদিককে ৫ হাজার ২০৫ পৃষ্ঠার তথ্যের মূল্য বাবদ ১০ হাজার ৪১০ টাকা জমা দেওয়ার চিঠি দেওয়া হয়। সেই অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাও দেন তিনি। কিন্তু অভিযোগ, অর্থ পরিশোধের পর চাহিদা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ তথ্য না দিয়ে মাত্র ১ হাজার ৪০০ টাকার সমপরিমাণ নথি দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। তথ্যের মূল্য নির্ধারণ নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জনি রায়ের বক্তব্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার বক্তব্যেও দেখা দিয়েছে প্রশ্ন ও অস্পষ্টতা। ৫ হাজার ২০৫ পৃষ্ঠার হিসাব কে তৈরি করেছেন, কীসের ভিত্তিতে অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছে, আর অর্থ জমা নেওয়ার পর তথ্যের পরিমাণ কমে গেল কেন– এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ আবেদনকারী সাংবাদিক জাহিদ হাসানের।

ঘটনাটি শুধু একজন সাংবাদিকের তথ্যপ্রাপ্তির জটিলতা নয়; সরকারি দপ্তরে তথ্যের মূল্য নির্ধারণ, নাগরিকের অধিকার এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়েও নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

দুই অর্থবছরের প্রকল্পের তথ্য চেয়েই জটিলতার শুরু: আবেদনকারীর সরবরাহ করা নথি অনুযায়ী, ধর্মপাশা উপজেলার ২০২৪-২০২৫ ও ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ও সাধারণ টিআর, কাবিখা ও কাবিটা প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ তালিকা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির তালিকা এবং প্রাক্কলনসংক্রান্ত তথ্য চেয়ে ১ জুলাই ২০২৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর আওতায় আবেদন করেন সাংবাদিক জাহিদ হাসান।

৫ জুলাই আবেদনটি গ্রহণ করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে তথ্য না পাওয়ায় ১১ আগস্ট সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা ও ইউএনওর কাছে তাগিদপত্র দেন তিনি। এরপরও তথ্য না পেয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করেন।

আপিল মামলা নম্বর ০২/২০২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য অভিযোগ শাখা থেকে ১১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ০৫.৪৬.৯০০০.০০০. ০১৮.০১.০০১১.১৯.২৪৩ নম্বর স্মারকে চিঠি দেওয়া হয়। এতে আবেদনকারীর চাহিদা অনুযায়ী আইনানুগভাবে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত জানানো হয়। পাশাপাশি পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহের জন্য ধর্মপাশার দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়।

১০ হাজার ৪১০ টাকা নির্ধারণ, সরকারি কোষাগারে জমা : এরপর ধর্মপাশা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ৪ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে ০৫.৪৬.৯০৩২.০০১.০১.০৬০.২২-৮৬২ নম্বর স্মারকে একটি চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিতে তথ্য অধিকার বিধিমালা অনুযায়ী ফটোকপি বাবদ প্রতি পৃষ্ঠা ২ টাকা হারে মোট ১০ হাজার ৪১০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

নির্দেশনা অনুযায়ী পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে ব্যাংক চালানের মাধ্যমে অর্থ জমা দিয়ে চালানের মূল কপি সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে দাখিল করতে বলা হয়। সেই অনুযায়ী ৬ অক্টোবর সোনালী ব্যাংকের নেত্রকোনা শাখার মাধ্যমে ১০ হাজার ৪১০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেন জাহিদ হাসান। ২৬২৭-০০২১৮৯৯৪৯৪১ নম্বর ব্যাংক চালানের অনুলিপিও সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে পাঠানো হয়।

প্রতি পৃষ্ঠা ২ টাকা হিসাবে ১০ হাজার ৪১০ টাকার অর্থ দাঁড়ায় ৫ হাজার ২০৫ পৃষ্ঠা। অর্থাৎ, আবেদনকারীর কাছে দেওয়া চিঠিতে তথ্যের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণের একটি নির্দিষ্ট হিসাব ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই হিসাবের সঙ্গে তথ্য সরবরাহের প্রস্তাবের পার্থক্য দেখা দেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে–মূল হিসাবটি কি যথাযথভাবে যাচাই করা হয়েছিল?

২৭ অক্টোবর কার্যালয়ে গিয়ে নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি : গত ২৭ অক্টোবর চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করতে ধর্মপাশা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে যান সাংবাদিক জাহিদ হাসান। তাঁর অভিযোগ, সেখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনি রায় উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট অফিস সহকারী রতন সরকারকে মাত্র ১ হাজার ৪০০ টাকার সমপরিমাণ তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতে বলেন।

আবেদনকারীর দাবি, উপস্থিত সাংবাদিক, রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও স্থানীয়

ব্যক্তিদের সামনেই এ নির্দেশ দেওয়া হয়। তখন তিনি প্রশ্ন তোলেন–১০ হাজার ৪১০ টাকার তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে লিখিত চিঠির মাধ্যমে অর্থ জমা নেওয়া হলেও এখন কেন মাত্র ১ হাজার ৪০০ টাকার তথ্য দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে? বাকি অর্থের হিসাব কী?

জাহিদ হাসানের ভাষ্য অনুযায়ী, জবাবে ইউএনও জানান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা বিষয়টি সমন্বয় করে দেবেন। তবে আবেদনকারী জানান, অর্থ ফেরত বা সমন্বয়ের বিষয়টি হলে তা সরকারি কোষাগারের বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় এবং লিখিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

এ ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, তথ্যের মূল্য নির্ধারণের সময় যে পরিমাণ নথির হিসাব দেওয়া হয়েছিল, তা কি পরে পরিবর্তন করা হয়েছে? পরিবর্তন করা হলে তার কারণ কী? আর সেই পরিবর্তনের বিষয়ে আবেদনকারীকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবহিত করা হয়েছিল কি না?

ইউএনও বললেন ৫ হাজার ২০৫ পৃষ্ঠার হিসাবের কথা : ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তিদের সামনে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনি রায় বলেন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয় থেকে ৫ হাজার ২০৫ পৃষ্ঠার হিসাব করে আবেদনকারীকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। সেই হিসাবের ভিত্তিতেই আবেদনকারী অর্থ জমা দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

ইউএনওর এই বক্তব্যের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে–৫ হাজার ২০৫ পৃষ্ঠার হিসাবটি কে প্রস্তুত করেছিলেন? কোন কোন প্রকল্পের কত পৃষ্ঠা নথি ধরে এই হিসাব করা হয়েছে? হিসাবটি কি আবেদনকারীর চাহিদাপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নির্ধারণ করা হয়েছিল? আর ওই হিসাবের ভিত্তিতে অর্থ গ্রহণের পর তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ভিন্ন পরিমাণের প্রস্তাব কেন দেওয়া হলো?

এমনকি ৫ হাজার ২০৫ পৃষ্ঠার হিসাবের নথিপত্র এখনো আবেদনকারীর হাতে পূর্ণাঙ্গভাবে পৌঁছেছে কি না, সেটিও স্পষ্ট নয়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার বক্তব্যে নতুন প্রশ্ন : এ সময় উপস্থিত ধর্মপাশা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জাকির হোসেন জানান, আবেদনকারীর চাহিদা অনুযায়ী তথ্যের জন্য এত টাকা নির্ধারণের বিষয়টি তাঁর কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয় থেকে কাগজ সরবরাহ করে এভাবে তথ্যের মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি তাঁর জানা নেই।

স্থানীয় জনতা, রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে তিনি আরও বলেন, তথ্য সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ এবং তথ্য দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি অবগত নন। তথ্য সরবরাহে অপারগতার কোনো কারণও নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তাহলে প্রশ্ন উঠছে, ইউএনওর বক্তব্য অনুযায়ী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যালয়ের হিসাবের ভিত্তিতে তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সেই হিসাব সম্পর্কে অবগত নন কেন? ৫ হাজার ২০৫ পৃষ্ঠার হিসাবটি কোন পর্যায়ে, কার মাধ্যমে এবং কীভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল?

তথ্য অধিকার আইন কী বলছে? তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ৪ ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আইনের ৯ ধারায় তথ্য সরবরাহের সময়সীমা এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যয়ের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। আইনের ৯(৭) ধারায় বলা হয়েছে, তথ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানের প্রকৃত ব্যয়–যেমন মুদ্রিত মূল্য, ইলেকট্রনিক ফরম্যাটের মূল্য কিংবা ফটোকপি ও প্রিন্টের ব্যয়–এর বেশি মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না। অন্যদিকে, আইনের ১৩ ধারায় তথ্যের অযৌক্তিক মূল্য দাবি করা হলে, অসম্পূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা হলে কিংবা তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারসংক্রান্ত অন্য কোনো সমস্যা দেখা দিলে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার সুযোগ রয়েছে।

এ অবস্থায় ১০ হাজার ৪১০ টাকা কীভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রকাশ করা এবং অর্থের বিপরীতে কত পৃষ্ঠা তথ্য সরবরাহ করা হবে, তা স্পষ্ট করা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগ যাচাইয়ের দাবি : জাহিদ হাসান যে তথ্য চেয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে ধর্মপাশা উপজেলার দুই অর্থবছরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও প্রাক্কলনসংক্রান্ত নথি। এসব তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের অনুমোদিত বরাদ্দ, পরিকল্পিত ব্যয় এবং বাস্তবায়নের প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করা সম্ভব।

তথ্য সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ নিয়ে অসংগতি ও দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগের পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তবে প্রকল্পে অর্থ আত্মসাৎ বা অনিয়মের অভিযোগের অভিযোগের বিষয়টি যাচাই বাচাই করে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বরাদ্দপত্র, বিল-ভাউচার, বাস্তবায়ন প্রতিবেদন, পরিমাপ বই এবং সরেজমিন তদন্ত প্রয়োজন।

আবেদনকারী সাংবাদিকের দাবি, তথ্য পাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর প্রকৃত অবস্থা যাচাই করতে চান। তাঁর মতে, তথ্যপ্রাপ্তির প্রক্রিয়ায় অস্পষ্টতা থাকলে সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে।

এখন যে প্রশ্নগুলোর জবাব প্রয়োজন : ৫ হাজার ২০৫ পৃষ্ঠার হিসাবটি কে এবং কীভাবে প্রস্তুত করেছিলেন? কোন কোন প্রকল্প ও নথির ভিত্তিতে ১০ হাজার ৪১০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল?অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা নেওয়ার পর মাত্র ১ হাজার ৪০০ টাকার তথ্য সরবরাহের প্রস্তাব কেন দেওয়া হলো?

তথ্যের পরিমাণ বা মূল্য পরিবর্তন হয়ে থাকলে তার লিখিত আদেশ ও হিসাব কোথায়? আবেদনকারীকে তাঁর চাহিদা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ তথ্য সরবরাহ করা হবে কি না?নঅতিরিক্ত অর্থের বিষয়টি কীভাবে এবং কোন বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তি করা হবে?

নথিই দেবে প্রকৃত উত্তর : ১০ হাজার ৪১০ টাকা জমা দেওয়ার ব্যাংক চালান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত তথ্যের মূল্য নির্ধারণসংক্রান্ত চিঠি, জেলা প্রশাসকের বরাবরে আপিল নিষ্পত্তির নির্দেশনা এবং ২৭ অক্টোবরের ঘটনাবিবরণী–সব মিলিয়ে বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন। এখন প্রয়োজন তথ্যের মূল্য নির্ধারণের পূর্ণাঙ্গ হিসাব প্রকাশ, সরবরাহ করা নথির প্রকৃত পরিমাণ নিশ্চিত করা এবং আবেদনকারীর তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার বাস্তবায়ন। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য প্রকাশ্যে আসা জরুরি।

কারণ, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য চাওয়া কোনো ব্যক্তিগত অনুগ্রহ নয়; এটি আইনসম্মত অধিকার। আর সেই অধিকার বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় যদি হিসাবের অসংগতি ও অস্পষ্টতা দেখা দেয়, তবে তার জবাবও হওয়া উচিত নথিভিত্তিক, স্বচ্ছ ও দায়িত্বশীল। এসব বিষয় ধর্মপাশা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে তার বক্তব্য জানতে তার সরকারি নাম্বারে একাদিক বার কল করেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এখন দেখার বিষয়, ধর্মপাশা উপজেলা প্রশাসন ৫ হাজার ২০৫ পৃষ্ঠার হিসাব, ১০ হাজার ৪১০ টাকা নির্ধারণ এবং পরবর্তী সময়ে ১ হাজার ৪০০ টাকার তথ্য দেওয়ার প্রস্তাবের বিষয়ে কী ব্যাখ্যা দেয়।

লাম্পট্যের অভিযোগে আওয়ামী আমলে বরখাস্ত

সেই জামানুরই জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী !



অপরাধচিত্র প্রতিবেদক : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বর্তমান প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) জামানুর রহমান একজন ফ্যাসিবাদের দোসর। এক সময় আওয়ামী লীগের মন্ত্রী, এমপিদের আত্মীয় ছিলেন। ছিলেন তাদের আস্থাভাজন ও আজ্ঞাবহ। ফলে বিভিন্ন অনিয়ম, নারী কেলেঙ্কারীর প্রমান থাকা সত্তেও তার শাস্তি হয়নি। এমনিকি বিভাগীয় মামলা, দুদকে অভিযোগ সবই যেন ম্যাজিকের মতো ভ্যানিস হয়ে যায়। অভিযোগ উঠেছে ওই দপ্তরের উচ্চ পদস্থ তার একাডেমিক ও হলের সিনিয়র থাকায় তিনি সব অভিযোগ থেকে পার পেয়ে যান। এর সুবাদে অনেককে বদলির ভয়ও দেখিয়ে তিনি সকল কাজ করিয়ে নেন। বিপুল পরিমান টাকাও হাতিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন সময়ে তার বিরুদ্ধে দুদক বা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে অভিযোগ দিলেও অদৃশ্য খুঁটির জোরে তা আমলে আসেনি।

সরকার যেই আসুক জামানুর তার। এটা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট। যখন যেখানে যে রুপ ধরতে হয়, তিনি তখন সেই রুপ ধারণ করেন। অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, সাময়িক বরখাস্তের সময় তিনি জীবন ধরাণ ভাতা ছাড়া অন্য কোন ভাতা বা সুবিধা পাননা। কিন্তু তিনি ওই সময়ে ভবিষ্য তহবিল থেকে ৩৭ লাখ টাকা উত্তোলন করেন। এ ছাড়া একই সময়ে তিনি তৎকালিন আওয়ামী লীগের মন্ত্রী তাজুল ইসলামের সুপারিশে লম্বা ছুটিও ভোগ করেন।

কুষ্টিয়ায় তার নিজ বাড়ি এবং মেহেরপুরে তার শশুর বাড়ি হওয়ার সুবাদে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, মাহবুবুল হক হানিফ, হাসানুল হক ইনুর সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন। অভিযোগ রয়েছে তিনি ৫ম গ্রেডের কর্মকর্তা হয়েও বেতন নিয়েছেন ৪র্থ গ্রেডের। এছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মন্ত্রীর বিশেষ আস্থাভাজন হওয়ায় পূর্বের তারিখে প্রমোশন নেন। যা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে ওপেন সিক্রেট। অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, প্রকৌশলী জামানুর রহমান আওয়ামী লীগের সময় থেকে এক টানা পাঁচ বছর খুলনা সার্কেলে চাকরি করছেন। ৫ই আগস্টের পর রূপ বদলে তিনি এখন আওয়ামী লীগ বিরোধি সেজেছেন।

খুলনার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী থাকাকালে তার ভয়ে দপ্তরের কেউ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারতো না। কেউ প্রতিবাদ করলে হয়রানি এবং মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হতো। দলবাজ এ প্রকৌশলী সিন্ডিকেট করে একই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে বার বার কাজ দিয়েছেন। নিম্নমানের কাজ করে বিল তুলতে অসাধু ঠিকাদারকে সাহায্য করেছেন। কোন কর্মকর্তা নিম্নমানের কাজের বিল দিতে অসম্মতি জানালে তার বিরুদ্ধে কারসাজি করে বিভিন্নভাবে হেনস্তা করতেন। এ নিয়ে তার আওয়াতাধীন বিভিন্ন জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের নানান কৌশলে হুমকি দিতেন তিনি।

৫ই আগস্টের পর তিনি নিজেকে আওয়ামী লীগ বিরোধী বলে দাবী করছেন। তিনি এখন আওয়ামী লীগকে ফ্যাসিস্ট বলে গালি দেন। আর এক সময় তিনিই ফুলের ডালী নিয়ে গেছেন টুঙ্গিপাড়ার মাজারে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে তার বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন রয়েছে বলে সবার কাছে প্রচার করছেন।

বাগেরহাট জেলার একজন প্রকৌশলী বলেন, তিনি অপকর্ম করতে সবসময় চাপ প্রয়োগ করেতেন। তার অন্যায় আবদার না শুনলে আওয়ামী লীগের ওমুক লিডার বিষয়টা দেখতে বলেছেন বলে শাসিয়ে তার লক্ষ্য পূরণ করে নিতেন। তাতেও কাজ না হলে বিভিন্ন মহল দ্বারা হেনস্থা করেতেন তিনি। খুলনা জোনের বিভিন্ন জেলায় টেন্ডার কারসাজি এবং অসাধু ঠিকাদারের নিম্ন মানের কাজের বিল জোর করে পাশ করিয়ে হাতিয়েছেন বিপুল পরিমাণ অর্থ।

অভিযোগ রয়েছে, তিনি বিভিন্ন সময়ে তার আস্থাভাজন এবং আওয়ামী লীগের ঠিকাদারদের কাজ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। অনভিজ্ঞ ঠিকাদার হলেও গুরুত্বপূর্ণ কাজ জোরপূর্বক তিনি তার সিন্ডিকেটকে দিতে বাধ্য করেন। তিনি তার কৌশল ব্যবহার করে এবং অর্থের জোরে বার বার পার পেয়ে যান। তবে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ-জামানুর রহমান ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ লোক। তিনি শতভাগ আওয়ামী সুবিধাভোগী।

বিগত ১৫ বছর ধরে তিনি আওয়ামী লীগের গোলামী করে আসছেন। শত প্রকার অনিয়ম,দুর্নীতি করেও রয়ে গেছেন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। বর্তমান সরকার আমলে তিনি নিজেকে বিএনপি সমর্থিত লোক বলে দাবী করে তার অতীত অপরাধ কর্মকাণ্ড ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

নারী কেলেংকারী, সাময়িক বরখাস্ত কাহিনী: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর খুলনা

সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী থাকাকালে জামানুর রহমান নিজের যৌন ক্ষুধা মেটাতে চাকরির প্রলোভনে তরুণীদের নিজের জালে ফাঁসান বলে অভিযোগ উঠেছে। কেউ তার অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হলে নানা অপবাদ দিয়ে হেনস্তা এমনকি ক্ষমতার অপব্যহার করে তরুণীদের পাগল সাজিয়ে জোরপূর্বক পাগলাগারদে পাঠানোর মতো অভিযোগও আছে জামানুর রহমানের বিরুদ্ধে।

২০২৩ সালে প্রকৌশলী জামানুর রহমান এক তরুণীকে পাগল অপবাদে ভর্তি করিয়েছেন মানসিক হাসপাতালে। ভাগ্যের জোরে পাবনা মানসিক হাসপাতাল থেকে মুক্তি মিললেও ওই তরুণীর দিন কাটছে অজানা আতঙ্কে।

ভুক্তভোগী ওই তরুণীর অভিযোগ, জামানুরের অনৈতিক প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় শিকার হয়েছেন নির্যাতনের, দীর্ঘ সময় থাকতে হয়েছে পাবনা মানসিক হাসপাতালে। অজ্ঞাত ফোন কল পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন স্বামী। এরপর পাবনা মানসিক হাসপাতাল থেকে মুক্তি মেলে তার। আদালতে তরুণীর দেওয়া জবানবন্দিতে উঠে আসে, দীর্ঘদিন কীভাবে জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রকৌশলী জামানুর রহমান সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চাকরি বাণিজ্য চালিয়ে আসছেন। পাশাপাশি চাকরি দেওয়ার নামে কীভাবে তরুণীদের ফাঁসাতেন নিজের জালে। ভুক্তভোগী তরুণী বলেন, ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে জামানুর রহমানের কাছে চাকরির জন্য গেলে তিনি বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন দেখান। এমনকি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীও তার খুবই ঘনিষ্ঠ বলে জানান তিনি। তাকে যা বলবে তাই প্রধান প্রকৌশলী করবেন বলে জানান জামানুর রহমান। তার কাছে একটা চাকরি দেওয়া তো সামন্য একটা ব্যাপার। যেন আমার চাকরি হয়েই গেছে। এরপর একপর্যায়ে প্রকৌশলী জামানুর আমাকে বলেন, 'এমনি এমনি এ জগতে কেউ কাউকে কিছুই দেয় না চাকরি তো দূরের কথা। কিছু পাইতে হলে কিছু দিতে হয়।' জামানুর রহমানের এমন মন্তব্যের পর তরুণী প্রকৃত বিষয়টি বুঝতে পেরে পিছু হটতে শুরু করলেই তার জীবনে নেমে আসে অমানিশার কালো অন্ধকার।

ভুক্তভোগী ওই তরুণীর স্বামী জানান, ফেনী থেকে একটা ফোনকল আসে এবং অপর প্রান্ত থেকে আমার স্ত্রীর নাম করে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি বলেন, তিনি পাবনা মেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এরপরই আমি বিষয়টি নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হই এবং আদালতের নির্দেশে আমার স্ত্রীকে মানসিক হাসপাতাল থেকে মুক্ত করি। তিনি বলেন, তাদের অনেক টাকা এবং লোকজন আছে। তাই আমরা জীবন ও সম্মান রক্ষার্থে আত্মগোপনে আছি। ক্ষতি যা হওয়ার তা তো হয়েছে, এখন বেঁচে থাকতে চাই।

এদিকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী বরাবরে গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর দাখিলকৃত এক অভিযোগে দেখা যায়, তিন পৃষ্ঠার ওই অভিযোগের ২০ নম্বর দফায় জামানুর রহমানের নারী কেলেঙ্কারির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, সংস্থার প্রধান প্রকৌশলী সাইফুর রহমানকে চাকরিতে নিয়োগের প্রার্থী জোগান দেন প্রকৌশলী জামানুর রহমান। তারই ধারাবাহিকতায় এক তরুণীকে চাকরি দেওয়ার কথা বলে দীর্ঘদিন সম্মানহানির পর তাকে চাকরি দিতে না পারায় ভুক্তভোগী তরুণী মুখ খুলতে পারে এমন ভয় থেকে তরুণীকে প্রথমে শিকলবন্দি করে আটকে রাখেন এবং পরে পাগল অপবাদে পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন প্রকৌশলী জামানুর রহমান।

বাংলাদেশ পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) তদন্তেও উঠে এসেছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জামানুর রহমানের তরুণীদের নিজের জালে ফাঁসানোর ঘটনাটি শিহরিত হয়ে ওঠার মতো। এমনকি প্রকৌশলী জামানুর রহমান তার অনৈতিক কর্মকান্ডের প্রমাণ নষ্ট করতে ভুক্তভোগী তরুণীর পরিবারের সহযোগিতা নিয়ে কীভাবে তাকে মানসিক রোগী সাজিয়েছেন। এই ঘটনার পর প্রকৌশলী জামানুর রহমানকে চাকরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। দীর্ঘদিন রবখাস্ত থাকার পর তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রিয় নেতা কুষ্টিয়ার এমপি মাহবুবুল আলম হানিফ ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর মাধ্যমে তদবীর করে বরখাস্ত আদেশ বাতিল করিয়ে চাকরিতে যোগদান করেন।

এ বিষয়ে প্রকৌশলী জামানুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ওটা অনেক আগের ঘটনা। ভুল বোঝাবুঝির সমাধান হয়েগেছে বলে পাশ কাটিয়ে যান।

এমন একজন ফ্যাসিবাদের দোসর, দুর্নীতিবাজ ও দুঃচরিত্র প্রকৌশলীকে কিভাবে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মতো একটি জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকৌশলী পদে পদায়ন করা হলো সেটাই এখন দেশবাসীর প্রশ্ন।

সাইকেল চুরির সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা : গ্রেপ্তার ১

অপরাধচিত্র প্রতিবেদক : চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় একটি বাইসাইকেল চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে মোবারক ইসলাম (২২) নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় পালিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়দের ধাওয়ায় মোহাম্মদ মুসা (৬৫) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে নগরীর পতেঙ্গা থানার চরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোবারক ওই এলাকার আবদুল মাবুদের ছেলে। জীবিকার তাগিদে একসময় একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন তিনি। সম্প্রতি বাবার চায়ের দোকানে সহযোগিতা করছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন আগে মোহাম্মদ মুসার ছেলের একটি বাইসাইকেল চুরি হয়। এ ঘটনায় মোবারককে সন্দেহ করা হচ্ছিল। পরে তাকে ডেকে নিয়ে স্থানীয় একটি মাঠে বাঁশ দিয়ে মারধর করা হয়। মাঠে মারধরের পর মোবারককে পাশের একটি গুদামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তার হাত-পা বেঁধে বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে নির্যাতন করা হয়। একপর্যায়ে মোবারক অচেতন হয়ে পড়লে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এরপর মরদেহ মাঠে ফেলে রেখে পালানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্তরা। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে এলে তারা ধাওয়া দিয়ে মুসাকে আটক করেন এবং পরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। নিহতের বাবার করা মামলায় মুসাকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ। মামলার অন্য আসামিরা এখনো পলাতক রয়েছে।

পতেঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পারভেজ আলী বলেন, প্রাথমিক তদন্তে বাইসাইকেল চুরির অভিযোগকে কেন্দ্র করে মুসা ও তার ছেলের মারধরের বিষয়টি জানা গেছে। মোবারককে শ্বাসরোধে হত্যার চেষ্টার বিষয়টিও তদন্ত করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, নিহতের বাবা বাদী হয়ে মুসাসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। গ্রেপ্তার মুসাকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে শনিবার আদালতে পাঠানো হবে। পলাতক অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।



স্বাস্থ্যমন্ত্রী-ভাগ্নিজামাই-ভাগিনা-সিন্ডিকেট যুক্ত হয়েছেন নতুন সচিবও

অপরাধচিত্র প্রতিবেদক : মন্ত্রী হিসেবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হাতে পাওয়ার পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল জনমনে চমক লাগানোর মতো কিছু ঘোষণা দিয়েছিলেন। এরমধ্যে অন্যতম ছিল দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স, ডাক্তারের পেছনে রোগীদের দৌড়ানোর পরিবর্তে রোগীদের পেছনে ডাক্তার দৌড়ানো, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেছে, তিনি বরং উল্টো পথেই চলেছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স এবং স্বাস্থ্যখাতের সমস্যা নিরসনের পরিবর্তে মিডিয়া কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে লোকদেখানো একের পর এক সারপ্রাইজ ভিজিট করেন।

এতে তিনি সংবাদ মাধ্যমের ফলাও কাভারেজ পেলেও স্বাস্থখাত সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। অথচ বর্তমান বিএনপি সরকারের বয়স প্রায় ৯ মাস অতিক্রান্ত হতে চললো।

দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নের পরিবর্তে বরং স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুলের বিরুদ্ধেই নতুন করে সিন্ডিকেট গড়ে তোলার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই সিন্ডিকেটে রয়েছেন মন্ত্রীর আপন ভাগ্নিজামাই, পিএস, এপিএস এবং মুখ্যসচিবের কথিত ভাগিনা, যিনি বর্তমানে সিএমএসডির পরিচালক পদে আছেন। এসব তথ্য ইতিপূর্বে একাধিক প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, নতুন করে এই সিন্ডিকেটে যুক্ত হয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিস্ট আমলের মাফিয়া গ্রুপের অন্যতম সদস্য, যুগ্মসচিব হেলাল উদ্দীন। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুলের আরেকটি বড় সাফল্য হলো, নতুন স্বাস্থ্যসচিব পদে যাকে পেয়েছেন ড. আ ন ম বজলুর রশীদ, তিনি বকুলের পছন্দের এবং সিন্ডিকেটের স্বার্থরক্ষায় তিনি অন্যদের চেয়ে এক পা এগিয়ে।

সচিব হিসেবে পদায়ন পাওয়ার পর এই কয়েক দিনে বেপরোয়া দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি এর নজিরও রেখেছেন।

ফ্যামিলি কার্ড কেলেঙ্কারির দায়ে বিভাগীয় কমিশনার পদ থেকে প্রত্যাহার হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য সচিব- এ যেন আলাদিনের চেরাগ!

গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব পদে পদায়নের মাত্র কয়েকদিন আগে আলোচিত ফ্যামিলি কার্ড কেলেঙ্কারির দায়ে ড. আ.ন.ম. বজলুর রশীদ রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার পদ থেকে প্রত্যাহার হয়েছেন। একই ঘটনায় একই দিনে নাটোর, গাইবান্ধা এবং রংপুরের জেলা প্রশাসককেও প্রত্যাহার করা হয়। গুরুতর অপরাধের দায়ে এদের সবাইকে শাস্তিমূলক বদলি হিসেবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। গত ১৮ আগস্ট তাদের প্রত্যাহার করা হয়। অথচ এর মাত্র ১৫ দিনের মধ্যেই ফ্যামিলি কার্ড কেলেঙ্কারির নায়ক ড. আ ন ম বজলুর রশীদ স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে পদোন্নতি পেলেন, যা 'আলাউদ্দিনের চেরাগের' চেয়েও আশ্চর্যের বিষয়, বলছেন সংশ্লিষ্টরা! বজলুর রশীদের হঠাৎ এমন অস্বাভাবিক পদোন্নতি ও পদায়নে জনপ্রশাসন সংশ্লিষ্ট সবাই কমবেশি অবাক হয়েছেন। তিনি কী এমন 'যাদুর কাঠি' সরকারের প্রভাবশালী মহলকে ছোঁয়ালেন যে, তাকে এমন অস্বাভাবিক 'পুরস্কার' দিতে হলো, সরকারের জন্য স্পর্শকাতর ফ্যামিলি কার্ড কেলেঙ্কারিতে ধরা পড়ার পরও- এমন প্রশ্ন সংশ্লিষ্টদের।

প্রতিমন্ত্রী বিদেশে থাকাকালে সচিবের নেতৃত্বে তিন দিনে ৮৭টি নথি সরাসরি মন্ত্রী পর্যন্ত অনুমোদন! স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব পদে যোগদান করেছেন বজলুর রশীদ গত ৬ সেপ্টেম্বর। সেপ্টেম্বর মাসের বাকি দিনগুলো লেগেছে পরিস্থিতি তার বুঝে নিতে। তারপরেই শুরু করেছেন সিন্ডিকেটের সঙ্গে মিলেমিশে অনিয়ম-অ পকর্ম, ভাগবাটোয়ারা। অক্টোবরের প্রথমদিকে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. এম এ মুহিত মাত্র তিন দিন দেশের বাইরে ছিলেন। এই তিন দিনে প্রতিমন্ত্রীর অনুপস্থিতি

দেখিয়ে মোট ৮৭টি নথি মন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুলের সঙ্গে যোগসাজশে অনুমোদন করিয়ে নেন সচিব। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, এই ৭৮টি নথির প্রায় প্রত্যেকটিই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট। এবং এ নথিগুলো প্রতিমন্ত্রী হয়েই মন্ত্রীর কাছে যাওয়ার কথা! প্রতিমন্ত্রী বিদেশে যাবেন, এটা পূর্ব নির্ধারিত ছিল। তাই নথিগুলো আগে থেকেই প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। প্রতিমন্ত্রী বিদেশে রওয়ানা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নথিগুলো দ্রুততার সঙ্গে উপরের দিকে উঠতে থাকে। 'প্রতিমন্ত্রী বিদেশে' এমন যুক্তিতে সচিব সরাসরি নথিগুলো মন্ত্রীর দপ্তরে পাঠিয়ে দেন। মন্ত্রীও দ্রুত অনুমোদন করে তা সচিবের কাছে পাঠান, যাতে প্রতিমন্ত্রী ফিরে আসার আগেই সব কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

প্রতিমন্ত্রী ডা. এম এ মুহিত প্রায়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, স্বাস্থ্যখাতে ভালো কিছু করার। কিন্তু ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্যখাতকেন্দ্রীক শক্তিশালী সিন্ডিকেট গড়ে উঠায় পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, প্রতিমন্ত্রী নিজেও অনেকটাই অসহায় হয়ে পড়েছেন, বলছেন সংশ্লিষ্টরা। প্রতিমন্ত্রীর অনুপস্থিতি দেখিয়ে তিন দিনে ৮৭টি নথি পার করে নেওয়ার ঘটনা এরই জ্বলন্ত নজির। এ নথিগুলো এমন জরুরি ছিল না যে, তিন দিন অপেক্ষা করা যেতো না। তবে প্রতিমন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে গেলে সিন্ডিকেটের বাণিজ্যটা ঠিকমতো হতো না।

উপসচিব পদোন্নতির সুপারিশে জাল-জালিয়াতি! : মন্ত্রণালয়ের সব নথিই মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী পর্যন্ত যায় না। অনেক নথি আছে, যেগুলো শুধুমাত্র সচিব পর্যায় পর্যন্ত অনুমোদনযোগ্য। এই নথিগুলোর বিষয়ে সিন্ডিকেট কী করছে, তা বোঝারও উপায় থাকে না প্রতিমন্ত্রীর বা অন্যদের। তবে কিছু ঘটনা এতোটাই গুরুতরভাবে ঘটে যে, তা আর গোপন রাখা সম্ভব হয়ে উঠে না। কোনো না কোনোভাবে ফাঁস হয়ে যায়। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও জেনে যায়। এ রকমেরই এক গুরুতর তথ্য পাওয়া গেছে উপসচিব পদে পদোন্নতিতে স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সুপারিশের নথিতে। স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের উপসচিব পদে পদোন্নতির জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে তালিকা পাঠাতে বলা হলে এ ব্যাপারে তালিকা চাওয়া হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছে। গত ৮ অক্টোবর, ২০২৬ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স্বাক্ষরিত ২৫ জনের একটা তালিকা প্রেরণ করা হয়। এই তালিকা অনুমোদনের জন্য যুগ্মসচিব (পার-২) সাইফুল ইসলাম উপরের দিকে নথি প্রেরণ করেন।

কিন্তু, পরবর্তীতে এই তালিকা নিয়ে অনেক জাল-জালিয়াতি হয়। মন্ত্রীর ভাগ্নিজামাই, মন্ত্রণালয়কেন্দ্রীক সিন্ডিকেটের অন্যতম হোতা, যুগ্মসচিব (পার) মোস্তাফিজুর রহমান এবং নতুন উপসচিব ডা. উম্মে হানি মাঝপথে নথি থামিয়ে ২৫ জনের ৭/৮ জনের নাম বাদ দিয়ে নতুন ৭/৮ জনের নাম যুক্ত করে ব্যাকডেট দিয়ে মহাপরিচালক এর স্বাক্ষর নিয়ে নতুন তালিকা ফাইলের সাথে সংযুক্ত করে জালিয়াতির আশ্রয় নেন। নতুন যুক্তদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা, ৫(পাঁচ) বছরের এসিআর না থাকা এবং স্বাচিপের সদস্য থাকারও অভিযোগ রয়েছে।

জাল-জালিয়াতির এই নথিটি এমন এক সময়ে অনুমোদন করা হয় যখন সংশ্লিষ্ট উইংয়ের অতিরিক্ত সচিব খোরশেদ আলম এবং যুগ্মসচিব সাইফুল ইসলাম (পার-২) বিদেশে অবস্থান করছিলেন। অতিরিক্ত সচিব খোরশেদ আলম এবং যুগ্মসচিব সাইফুল ইসলাম (পার-২) এর স্বাক্ষর ছাড়াই নথিটি যুগ্মসচিব (পার) মোস্তাফিজুর রহমান এবং সচিব বজলুর রশীদ অনুমোদন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে তালিকা পাঠিয়ে দেন, যদিও দুই কর্মকর্তার স্বাক্ষরবিহীন এবং তাদের পাশ কাটিয়ে নতুন তালিকা সংযুক্ত করা বেআইনি। কর্তৃত্ব খাটিয়ে সচিবকে ম্যানেজ করে ও যোগ্যদের নামের সঙ্গে মিথ্যা ট্যাগ লাগিয়ে এ ধরনের অনৈতিক কাজ করেছে সিন্ডিকেট। এক্ষেত্রে বড় অংকের অর্থের লেনদেন হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের কুখ্যাত রউফ তালুকদারের সহযোগী, আলোচিত 'মেসি'র আগমন স্বাস্থ্যে : যুগ্মসচিব হেলাল উদ্দীন আওয়ামী লীগ আমলে একনাগাড়ে তিনজন অর্থসচিবের পিএস পদে কাজ করেছেন। তারমধ্যে আব্দুর রউফ তালুকদার একজন। আর্থিক খাত লুটপাটের অন্যতম হোতা, কুখ্যাত আব্দুর রউফ তালুকদারের পিএস হিসেবে থেকে তাঁর মানি কালেক্টরের দায়িত্বও পালন করেছেন এই হেলাল উদ্দীন। ব্যাংকিংসহ পুরো আর্থিক খাতের লোকজন তাকে সেভাবেই দেখেছে। এই ফ্যাসিস্ট কর্মকর্তাকে গণঅভ্যুত্থানের পরে শাস্তিমূলক বদলি হিসেবে ভূমি সংস্কার বোর্ডের উপভূমি সংস্কার কমিশনার পদে ডাম্পিং পদায়নে দেওয়া হয়েছিল। বিএনপির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল সম্প্রতি তাকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে এনে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ক্রয় ও সংগ্রহ অধিশাখার দায়িত্বে বসিয়েছেন। কুখ্যাত আব্দুর রউফ তালুকদারের সহযোগী, ফ্যাসিস্ট, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা হেলাল উদ্দীনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পদায়ন এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়াকে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্টরা দুর্নীতিতে 'মেসি'র আগমন হিসেবেই দেখছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুলের এ ধরনের পছন্দকে 'রতনে রতন চেনে' বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

এদিকে সিএমএসডির পরিচালক পদে বসে এখন সারাদেশের হাসপাতালগুলোর কেনাকাটা নিয়ন্ত্রণ করছেন মোহাম্মদ শফিউর রহমান, যিনি আওয়ামী আমলে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষে প্লট দুর্নীতি-জালিয়াতির জন্য বহুলভাবে আলোচিত। আর মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীক অন্যান্য কেনাকাটা নিয়ন্ত্রণ করছেন যুগ্মসচিব হেলাল উদ্দীন। আরেক যুগ্মসচিব মুস্তাফিজুর রহমান, যিনি মন্ত্রীর আপন ভাগ্নি জামাই, তার নিয়ন্ত্রণে চিকিৎসকদের বদলি-পদায়নসহ সার্বিক কর্মকাণ্ড। এছাড়া মন্ত্রীর পিএস এ বি এম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার এবং মন্ত্রীর এপিএস মোস্তাফিজুর রহমান তো রয়েছেনই।

সিএমএসডি'র পরিচালক শফিউর রহমানের গ্রামের বাড়ি বগুড়ায়। সেই সূত্রে তিনি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের 'ভাগিনা' পরিচয় দিয়ে থাকেন। তবে তার ক্ষমতার উৎস্য হলো 'টাকা' আর দুর্নীতির কলাকৌশল। ৫ আগস্টের আগে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট আমলে প্রশাসনের ২৪ ব্যাচের এই কর্মকর্তা নিজেকে 'ছাত্রলীগ' নেতা বলে পরিচয় দিতেন। ওই সময় ফ্যাসিস্টের সহযোগী হিসেবে আকর্ষণীয় পদোন্নতিসহ নানা রকমের সুযোগ-সুবিধা বাগিয়ে নিয়েছেন। আকর্ষণীয় পদায়নে থেকে বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিক হয়েছেন। বিশেষ করে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের পরিচালক পদে প্রায় তিন বছর একনাগাড়ে থেকে প্লট জালিয়াতিসহ নানা অনিয়ম-অপকর্মের মাধ্যমে আখের গুছিয়ে নিয়েছেন। সেইসব অর্থের কিছু অংশ ব্যয় করে অর্ন্তবর্তী সরকারের আমলে নতুন করে 'ক্ষমতাবান' হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। অর্ন্তবর্তী সরকারের আমলে টাকার জোরে পদায়ন নিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। উদ্দেশ্য ছিল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে পদায়ন নেওয়া। সেখানে যেতে পারলে আবারও কাড়ি কাড়ি টাকা কামানো যেতো। কিন্তু অনেক চেষ্টা-তদবির করেও সম্ভব হয়নি, যেহেতু এর আগেই অন্য একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল এ অধিদপ্তরটি। অবশেষে সেই চিন্তা বাদ দিয়ে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-তে অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে পদায়ন নেন। অবৈধ অর্থ আয়ের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন এই পদটি ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের চেয়েও আকর্ষণীয় পদ হিসেবে বিবেচিত। তবে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন করে ভাগ্য খুলে যায়- বন্ধু, ব্যাচমেট মুস্তাফিজুর রহমানের মামাশশুর

সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বকুল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ায়। মুস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে জোট বাঁধেন স্বাস্থ্যখাত লুটপাটের। পদায়ন নেন সিএমএসডি'র পরিচালক পদে, যেখানে স্বাস্থ্যখাতের অধিকাংশ কেনাকাটাগুলো হয়ে থাকে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের ঘোষণার অন্তরালে সিন্ডিকেটের সঙ্গে গোপন বৈঠক!

২০২৬ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বকুল। পরদিন ১৮ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ে যোগ দিয়েই তিনি দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে কোনো দুর্নীতি হতে দেওয়া হবে না এবং কোনো সিন্ডিকেটের কবলে পড়বেন না। একই সঙ্গে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের সময়মতো উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ৩০ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেন। কিন্তু প্রশাসনিক ঘোষণা আর কার্যকর পরিবর্তন এক বিষয় নয়। স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি ও সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করতে হলে শুধু হাসপাতাল পরিদর্শন বা তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক নির্দেশ যথেষ্ট নয়। বরং এগুলোকে 'আইওয়াশ' হিসেবে বিবেচনা করছেন সংশ্লিষ্টরা। প্রয়োজন রয়েছে ক্রয়-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, নিয়োগে মেধার মূল্যায়ন, বদলি-পদায়নে নিয়মনীতি অনুসরণ, প্রকল্পের ব্যয় নিরীক্ষা এবং অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ব্যবস্থা। কিন্তু সেদিকে মন্ত্রীর মোটেই নজর নেই। মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পরও বিভিন্ন হাসপাতালে অনিয়ম এবং শক্তিশালী সিন্ডিকেট গড়ে উঠার খবর প্রকাশিত হয়েছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে সর্বশেষ এমন তথ্যও জানা গেছে, মাফিয়া মিঠু, সাজ্জাদ মুন্সীসহ স্বাস্থ্যখাত সংশ্লিষ্ট আওয়ামী আমলের দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটগুলোর সঙ্গে মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছে। বহুল আলোচিত মাফিয়া ঠিকাদার মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠু গ্রেফতারের ভয়ে বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন। কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার সিন্ডিকেটের নিয়মিত যোগাযোগ আছে। দু'একজনের সঙ্গে মন্ত্রীর গোপন বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ রকমের একটি বৈঠকের ছবিসহ সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে বহুল আলোচিত দুর্নীতিবাজ ঠিকাদার সাজ্জাদ মুন্সীর সঙ্গে মন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল বৈঠক করছেন। বৈঠকটি হয়েছে বিশেষ একটি গোপন স্থানে। এই বৈঠকের ফলোআপ ফলাফল কি দাঁড়িয়েছে সেই তথ্য অবশ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

খুলনার কয়রা উপজেলায় এলজিইডিতে প্রকৌশলী নেই আটকে আছে বিল-ভাউচার

অপরাধচিত্র প্রতিবেদন : খুলনার কয়রা উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) কার্যক্রমে জনবল সংকট দেখা দিয়েছে। উপজেলা প্রকৌশলীর পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। এর মধ্যে একমাত্র উপসহকারী প্রকৌশলীকে বদলি করায় কার্যত কর্মকর্তা- শূন্য হয়ে পড়েছে কয়রা এলজিইডি অফিস। ফলে উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তদারকি, কাজের মান যাচাই ও দাপ্তরিক কার্যক্রম নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

অফিস সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ মাসের অধিক সময় ধরে কয়রা উপজেলা প্রকৌশলীকে বদলি করা হলেও সেই স্থলে কাউকে পদায়ন করা হয়নি। সেই থেকে কয়রা উপজেলা প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করছেন উপজেলা থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরের পার্শ্ববর্তী পাইকগাছা উপজেলা প্রকৌশলী অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে।

অথচ পাইকগাছা উপজেলায় রয়েছে ১০টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা। অন্যদিকে কয়রা উপজেলায় রয়েছে সাতটি ইউনিয়ন। দুই উপজেলার মোট ১৭টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে একজন প্রকৌশলীকে।

এদিকে এলজিইডির উপজেলা পর্যায়ের প্রকৌশল দপ্তরে বিভিন্ন উন্নয়নকাজের তদারকি ও কারিগরি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণত একাধিক উপসহকারী প্রকৌশলীর প্রয়োজন হয়। কয়রা অফিসে জনবল সংকটের কারণে আগে মাত্র একজন উপসহকারী প্রকৌশলী কর্মরত ছিলেন। তাকেও গত ৪ নভেম্বর বদলি করে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে। তার স্থলে আর কাওকে পদায়ন করা হয়নি। ফলে কয়রা অফিসে মাঠপর্যায়ের কাজ তদারকির দায়িত্ব পালনের মতো কোনো উপসহকারী প্রকৌশলী বর্তমানে নেই বলে জানা গেছে।

এ অবস্থায় কয়রা উপজেলার গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার, সেতু-কালভার্ট নির্মাণ, বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং নির্মাণকাজের গুণগত মান নিশ্চিত করা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। একজন প্রকৌশলীর পক্ষে দুটি উপজেলার বিপুলসংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্পের নিয়মিত তদারকি কতটা সম্ভব, তা নিয়েও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, প্রয়োজনীয় প্রকৌশলী ও কারিগরি জনবল না থাকলে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন, কাজের গুণগত মান এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প শেষ করার ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হতে পারে। বিশেষ করে উপকূলীয় ও দুর্যোগপ্রবণ কয়রা উপজেলার যোগাযোগ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে পর্যাপ্ত প্রকৌশলীর উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কয়রা উপজেলার ঠিকাদার ইমরান হোসেন বলেন, পাইকগাছা উপজেলা প্রকৌশলী কয়রার অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করলেও তিনি সপ্তাহে মাত্র এক দিন কয়রা অফিসে আসেন। অনেক সময় সেটিও সম্ভব হয় না। ফলে উন্নয়নকাজের তদারকি, বিল-ভাউচার সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ বিভিন্ন দাপ্তরিক কাজে আমাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এভাবে একটি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন। তাই কয়রার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে আমরা দ্রুত একজন স্থায়ী উপজেলা প্রকৌশলী নিয়োগের দাবি জানাচ্ছি।

স্থানীয় একাধিক ব্যক্তির বলেছেন, কয়রা এলজিইডি অফিসে দ্রুত উপজেলা প্রকৌশলী নিয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় উপসহকারী প্রকৌশলী ও অন্যান্য জনবল পদায়ন করতে হবে। অন্যথায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নিয়মিত তদারকি ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এলজিইডি খুলনার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. কামরুল ইসলাম সরদার বলেন, কয়রা উপজেলা এলজিইডি অফিসে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা না থাকার বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। সম্প্রতি নতুন নিয়োগের মাধ্যমে কিছু কর্মকর্তা যোগদান করেছেন। জনবল সংকট নিরসনে কয়রা অফিসে দ্রুত একজন উপজেলা প্রকৌশলী ও উপসহকারী প্রকৌশলী পদায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। আশা করছি, অল্প সময়ের মধ্যেই এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।


Sonali e-Wallet
সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বিশ্বস্ত ও স্মার্ট
লেনদেন হোক
স্মার্ট ও সহজ
Sonali e-Wallet
এখন আপনার সেবায় ২৪/৭
দেশ কিংবা বিদেশ থেকে
লেনদেন করুন
Sonali e-Wallet এ
ডিপিএস জমা
রেমিটেন্স সেবা
মোবাইল রিচার্জ
ইউটিলিটি বিল-পে
SOD লোন
ন্যানো লোন
লোন রি-পে
বাংলা QR
স্বাধীন ক্যাশ
ক্রেডিট কার্ডের বিল প্রদান
ব্যাংকের যেকোন শাখা ও
এটিএম বুথের লোকেশন
যেকোন শাখা থেকে
চেকবিহীন ক্যাশ আউট সুবিধা
DPS এবং FDR
একাউন্ট ওপেন
Cheque Book
রিকোয়েস্ট
একাউন্ট ব্যালেন্স
ও স্টেটমেন্ট
BEFTN/NPSB/RTGS এর মাধ্যমে
যেকোন ব্যাংকের একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার
একাউন্ট থেকে ওয়ালেটে
ওয়ালেট থেকে একাউন্টে টাকা ট্রান্সফার
সোনালী ব্যাংকের যেকোন
একাউন্টে বা ওয়ালেটে টাকা ট্রান্সফার
24/7 HOTLINE
16639
OR 09610016639
www.sonalibank.com.bd
DOWNLOAD FOR
Sonali e-Wallet
Google Play
App Store

ডিসির নির্দেশের পরও তিন মাসেও মেলেনি তথ্য

তথ্য অধিকার আইন মানছেন না ইউএনও-পিআইওরা

অপরাধচিত্র প্রতিবেদক (নেত্রকোণা): সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন ও অনুমোদনসংক্রান্ত তথ্য চেয়েও মিলছে না পূর্ণাঙ্গ নথি। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আবেদন, আপিল, নির্ধারিত ফি জমা এবং জেলা প্রশাসকের নির্দেশনার পরও তথ্য সরবরাহে গড়িমসির অভিযোগ উঠেছে নেত্রকোণার আটপাড়া, বারহাট্টা ও মদন উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের (পিআইও) বিরুদ্ধে।

কোথাও কমিটি গঠন ও অনুমোদনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়াই নথি দেওয়া হয়েছে, কোথাও তালিকা থেকে কলম দিয়ে মুছে ফেলা হয়েছে সদস্যদের মোবাইল নম্বর, আবার কোথাও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অজুহাতে তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করা হয়েছে। এমনকি তথ্যের ফটোকপি বাবদ সরকারি কোষাগারে নির্ধারিত অর্থ জমা দেওয়ার পরও প্রায় তিন মাস ধরে তথ্য না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এসব ঘটনায় সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

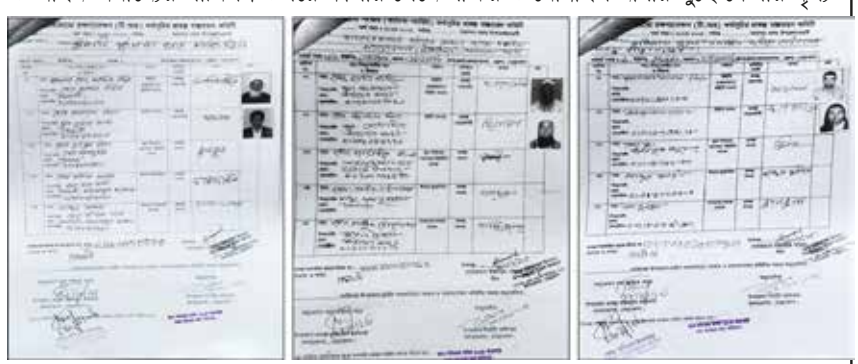
অপরাধচিত্র'র প্রতিনিধি তথ্য অধিকার আইনে করা আবেদন, আপিল, সরকারি দপ্তরের চিঠিপত্র, ব্যাংক চালান ও সরবরাহ করা নথি পর্যালোচনায় এসব অসংগতি সামনে এসেছে। তাঁর অভিযোগ, বিভিন্ন উপজেলায় সরকারি প্রকল্পের তথ্য চেয়েও আবেদনকারীরা প্রয়োজনীয় ও পূর্ণাঙ্গ নথি পাচ্ছেন না।

আটপাড়ায় ডিসির নির্দেশ, তবুও অসম্পূর্ণ নথি : আটপাড়া উপজেলায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নেওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন ও অনুমোদনসংক্রান্ত তথ্য চেয়েছিলেন জাহিদ হাসান। প্রয়োজনীয় নথি না পেয়ে গত ২ আগস্ট জেলা প্রশাসকের কাছে আপিল করেন তিনি।

এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৭ আগস্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য ও অভিযোগ শাখা থেকে বিপুলসংখ্যক নথি সরবরাহ করা হয়। তবে সেগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, অধিকাংশ পিআইসি ফরমের সঙ্গে কমিটি গঠনের প্রস্তাব, সভাপতি, সদস্য-সচিব ও সদস্যদের স্বাক্ষর, ছবি, পরিচয়পত্র এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসংক্রান্ত কাগজপত্র সংযুক্ত নেই।



সংশ্লিষ্ট ইউএনও নিজ হাতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সেক্রেটারি ও সদস্যদের নাম এবং মোবাইল নম্বর কর্তনসহ স্বাক্ষর বিহীন তথ্য সরবরাহ করায় তথ্য অধিকার আইনের পরিপন্থী ও আইন অমান্যের শামিল। উপরে কালার পেনে স্বাক্ষর ও মোবাইল নাম্বার মুছে ফেলার দৃশ্য



বিশেষ করে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের কাবিটা কর্মসূচির সাধারণ তৃতীয় পর্যায়ের ৩ নম্বর প্রকল্পের কমিটি গঠনের প্রস্তাবসংক্রান্ত নথিতে প্রয়োজনীয় সহায়ক কাগজপত্র না থাকায় কমিটি যথাযথ প্রক্রিয়ায় গঠিত ও অনুমোদিত হয়েছিল কি না, তা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় ১৯ সেপ্টেম্বর পূর্ণাঙ্গ ও অনুমোদিত পিআইসি নথি চেয়ে পুনরায় আবেদন করেন তিনি। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের তথ্য ও অভিযোগ শাখা থেকে ১২ অক্টোবর আটপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে চিঠি দেওয়া হয়। সহকারী কমিশনার মাসুম আহমদ স্বাক্ষরিত ওই পত্রে তথ্য অধিকার আইনে তথ্য প্রদানে বাধা না থাকলে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তা সরবরাহের নির্দেশনা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রয়োজনীয় নথি পাওয়ার বিষয়টি এখনো প্রশ্নের মুখে।

বারহাট্টায় নথি থেকে নম্বর মুছে দেওয়ার অভিযোগ : বারহাট্টা উপজেলায় তথ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া নিয়েও উঠেছে গুরুতর প্রশ্ন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের টিআর, কাবিখা, কাবিটা সাধারণ ও বিশেষ দ্বিতীয় পর্যায়ের ১১০টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কমিটির তালিকা ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র চেয়ে গত ৬ আগস্ট আবেদন করেন অপরাধচিত্র'র প্রতিনিধি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রতিপৃষ্ঠার ফটোকপি বাবদ দুই টাকা হিসাবে মোট ২২০ টাকা ব্যাংক চালানের মাধ্যমে জমা দিতে বলা হয়। নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থ পরিশোধও করেন তিনি।

তবে ১৩ অক্টোবর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেলিনা আক্তার স্বাক্ষরিত এক পত্রে তথ্য অধিকার আইনের ৭(জ) ধারার উল্লেখ করে কমিটির সদস্যদের মোবাইল নম্বর, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও স্বাক্ষর প্রকাশ করলে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানানো হয়। একই সঙ্গে তথ্য সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করে আইনের ৯(৯) ধারার উল্লেখসহ প্রস্তুত করা নথির ফটোকপি সংগ্রহের কথা বলা হয়।

ওই পত্রে দাবি করা হয়, আবেদনকারী ১২ অক্টোবর মৌখিকভাবে তথ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তবে প্রতিনিধির বক্তব্য, তিনি পূর্ণাঙ্গ ও অনুমোদিত পিআইসি নথি চেয়েছিলেন। অথচ সরবরাহের জন্য প্রস্তুত করা তালিকায় কমিটির সভাপতি, সদস্য-সচিব ও সদস্যদের স্বাক্ষর ছিল না। এমনকি সদস্যদের নামের পাশে থাকা মোবাইল নম্বরগুলোও রঙিন কলম দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছিল।

তাঁর অভিযোগ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিজ হাতে নম্বরগুলো মুছে দিয়ে এমন একটি অসম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করেছেন, যা দিয়ে কমিটি গঠনের সত্যতা কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দায়িত্বপ্রাপ্তির বিষয়টি যাচাই করা সম্ভব নয়।

এ ঘটনায় ২৭ অক্টোবর ইউএনওর কাছে লিখিত জবাব ও পুনর্বিবেচনার আবেদন করেন অপরাধচিত্রের প্রতিনিধি । সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, সরকারি অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পের কমিটি গঠন, সদস্য নির্বাচন, দায়িত্ব বণ্টন, স্বাক্ষর ও অনুমোদনসংক্রান্ত তথ্য জনস্বার্থের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। এসব তথ্য প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দাবি, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনীয় সংবেদনশীল তথ্যের ক্ষেত্রে আইন অনুসরণ করা যেতে পারে; কিন্তু সেই অজুহাতে পুরো কমিটির পরিচয় ও অনুমোদনসংক্রান্ত তথ্য আটকে রাখা গ্রহণযোগ্য নয়।

অপরাধচিত্রের প্রতিনিধি আরও জানান, অন্যান্য উপজেলা ও সরকারি দপ্তর থেকে একই ধরনের প্রকল্পের পিআইসি সদস্যদের নাম, স্বাক্ষর ও মোবাইল নম্বরসংবলিত শতাধিক নথি সংগ্রহ করেছেন তিনি। সেসব ক্ষেত্রে এমন আপত্তির মুখে পড়তে হয়নি। ফলে বারহাট্টায় তথ্য সরবরাহে ভিন্ন অবস্থান নেওয়ার কারণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

মদনে তিন মাসেও মিলছে না তথ্য : একই ধরনের ভোগান্তির অভিযোগ রয়েছে মদন উপজেলাতেও। আবেদনকারী জানান, চাহিত তথ্যের ফটোকপি বাবদ নির্ধারিত অর্থ ব্যাংক চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দিয়েছেন তিনি। এরপরও প্রায় তিন মাস পার হলেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে পাননি।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. হুমায়ুন কবির এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বারবার তথ্য দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে তা সরবরাহ করা হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর। কখনো 'দেব', কখনো 'দিচ্ছি'–এমন আশ্বাসে দিনের পর দিন পার হলেও তথ্য না পাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আবেদনকারী।

প্রশাসনিক জবাবদিহি নিয়ে প্রশ্ন : সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ, পিআইসি গঠন, সদস্য নির্বাচন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নসংক্রান্ত তথ্যের সঙ্গে জনগণের অর্থের ব্যবহার সরাসরি জড়িত। এসব নথি যাচাইয়ের সুযোগ না থাকলে প্রকল্পের যথার্থতা, অর্থ ব্যয়ের স্বচ্ছতা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা কঠিন।

তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য হলো সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করা। অথচ আবেদন ও আপিলের পরও প্রয়োজনীয় নথি না পাওয়া, অসম্পূর্ণ তালিকা সরবরাহ এবং নির্ধারিত ফি গ্রহণের পর দীর্ঘদিন অপেক্ষায় রাখার অভিযোগ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

বিশেষ করে আটপাড়ায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে তথ্য সরবরাহের নির্দেশনা দেওয়ার পরও আবেদনকারী প্রয়োজনীয় নথি পেয়েছেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে বারহাট্টা ও মদনের ঘটনাও তথ্য অধিকার আইনের মাঠপর্যায়ের বাস্তবায়ন নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ইউএনও ও পিআইওদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত, অসম্পূর্ণ নথির পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ ও আইনসম্মত তথ্য সরবরাহ এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে প্রশাসনিক তদারকি জোরদারের দাবি জানিয়েছেন সাংবাদিক সমাজ।

নাফ নদ থেকে ২ লাখ ইয়াবাসহ গ্রেফতার ১



অপরাধচিত্র প্রতিনিধি : কক্সবাজার টেকনাফ ব্যাটালিয়নের (২ বিজিবি) বিশেষ অভিযানে নাফ নদ হয়ে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পাচারকালে ২ লাখ ১০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ১টি ফোন জব্দ করা হয়েছে।

১৪ নভেম্বর শনিবার সকালে টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

এ সময় সাবরাং ইউনিয়নের গোলার পাড়া এলাকার লালু মিয়ার ছেলে মো. হোসেনকে (৫০) আটক করা হয়। ওই ঘটনায় একই এলাকার বসুর ছেলে মো. শাকেরকে পলাতক আসামি করা হয়েছে।

লে. কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় যে, টেকনাফ ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ সাবরাং বিওপির দায়িত্বপূর্ণ জিন্নাখাল নামক স্থান দিয়ে নাফ নদ হয়ে মায়ানমার হতে ইয়াবার একটি বড় চালান বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে। সাবরাং বিওপির বিশেষ টহল দল ১টি স্পিডবোটসহ নাফ নদের সম্ভাব্য প্রবেশপথে কৌশলগত অবস্থান গ্রহণ করে।

পরবর্তীতে রাতে বিজিবির বিশেষ টহল দলের থার্মাল ইমেজার এবং রাডারের মাধ্যমে মিয়ানমার থেকে আগত ২ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তির গতিবিধি শনাক্ত করা হয়। বিজিবির আভিযানিক দল তাদের গতিবিধি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। একপর্যায়ে উক্ত ব্যক্তিদের বস্তাসহ সাঁতরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এ সময় বিজিবির আভিযানিক দলের উপস্থিতি টের পেয়ে রাতের অন্ধকারের সুযোগে ১ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তি সাঁতরে পার্শ্ববর্তী কেওড়াবাগানে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে বিজিবির আভিযানিক দল অপর ১ জন ব্যক্তিকে ১টি বস্তাসহ নাফ নদ থেকে আটক করে। আটককৃত ব্যক্তির সঙ্গে থাকা বস্তাটি তল্লাশি করে বিশেষভাবে মোড়কজাত অবস্থায় ২ লাখ ১০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও বলেন, আটক আসামি ও জব্দকৃত ইয়াবা ট্যাবলেট এবং অন্যান্য আলামত নিয়মিত মামলার মাধ্যমে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পল্টিবাজ আওয়ামীপ্রেমী এখন বিএনপি পরিচয়ে আলোচিত সুবিধাভোগী ফিরোজ মিয়া



অপরাধচিত্র প্রতিবেদক : সরকারি দপ্তরে রাজনৈতিক প্রভাব, অতীত কর্মকাণ্ড ও প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সুবিধাভোগী হিসেবে পরিচিত থাকার অভিযোগ এবং ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর নতুন রাজনৈতিক পরিচয়ে নিজেকে উপস্থাপনের দাবি ঘিরে আলোচনায় এসেছেন মোঃ ফিরোজ মিয়া, সহকারী পরিচালক, বেসরকারি কলেজ-৩। তাঁকে ঘিরে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত ও অতীত কর্মকাণ্ড যাচাইয়ের দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারীরা।

অতীত রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন : অভিযোগকারীদের দাবি, বিগত সরকারের আমলে প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে মোঃ ফিরোজ মিয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর তাঁর অবস্থান ও রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিবর্তন এসেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

তবে এসব অভিযোগের পক্ষে স্বাধীনভাবে যাচাই করা প্রমাণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য এখনো নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। ফলে অভিযোগগুলোর সত্যতা নির্ধারণে প্রশাসনিক নথি, অতীত কর্মকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য যাচাইয়ের দাবি উঠেছে।

নিজ জেলা পরিচয় নিয়েও বিতর্ক : তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় নিয়েও একটি অভিযোগ সামনে এসেছে। অভিযোগকারীদের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁর গ্রামের বাড়ি জয়পুরহাট হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে বগুড়ার বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এ বিষয়টিরও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই প্রয়োজন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহি কোথায়? একজন সরকারি কর্মকর্তার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতেই পারে। তবে সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা অনৈতিক সুবিধা গ্রহণের অভিযোগ উঠলে তা তদন্তের আওতায় আনা প্রশাসনিক স্বচ্ছতার স্বার্থেই গুরুত্বপূর্ণ।

এ ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রশ্ন সামনে এসেছে:

বিগত সরকারের আমলে মোঃ ফিরোজ মিয়ার প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা কী ছিল?

রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে কোনো বিশেষ সুবিধা গ্রহণের অভিযোগের সত্যতা রয়েছে কি?

৫ আগস্টের পর তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের অভিযোগ কতটা সত্য?

তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাচাই করেছে কি?

সরকারি দায়িত্ব পালনে তাঁর নিরপেক্ষতা, পেশাগত সততা ও জবাবদিহি নিশ্চিত হয়েছে কি?

নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি : সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে কর্মকর্তাদের অতীত কর্মকাণ্ড এবং প্রশাসনিক ভূমিকা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা জরুরি। রাজনৈতিক পরিচয়ের পরিবর্তন নয়, বরং সরকারি দায়িত্ব পালনে সততা, যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতাই হওয়া উচিত মূল্যায়নের প্রধান মানদণ্ড।

সিদ্ধিরগঞ্জে সন্ত্রাসবিরোধী মামলার আসামিসহ গ্রেপ্তার ৮

অপরাধচিত্র প্রতিবেদক : নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে সন্ত্রাসবিরোধী মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আ, লীগ, যুবলীগ ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ৩ নেতাসহ ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত ১৩ নভেম্বর শুক্রবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মো. এমদাদুল হক। এর আগে, গত ১২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাতে থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তাররা হলেন- সন্ত্রাসবিরোধী মামলার আসামি সিদ্ধিরগঞ্জের সাইলোগেইট এলাকার মৃত আব্দুল আজিজের ছেলে নাসিক ৫নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগের শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মো. হায়দার খান (৩০), সুমিলপাড়া বিহারী কলোনির মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে নাসিক ৬নং ওয়ার্ড যুবলীগ কর্মী বাবুল প্রকাশ বাবু (২৪) ও আটি ওয়াপদা কলোনির আব্দুল সাত্তার মোল্লার ছেলে নাসিক ৪নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সুমন মাহমুদ (৩৮)।

এছাড়া সামারি ট্রায়ালের অভিযুক্ত সাইনবোর্ড মিতালি মার্কেট এলাকার বাসিন্দা জসিম উদ্দিনের ছেলে আপন মিয়াকে (২০) কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সিআর মামলার ওয়ারেন্ট থাকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে গোদনাইল সৈয়দপাড়ার মৃত মো. হাসেম কাজীর ছেলে মো. রহমান কাজী ও শাহাদাত হোসেন কাজীকে। পূর্বের মাদক মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে শিমরাইল বউবাজারের মৃত আব্দুল আজিজের ছেলে মো. আনিস (২৬) ও সুমিলপাড়া বিহারী কলোনির মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে মো. মোবারক হোসেন কালে খানকে (২৮)।

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মো. এমদাদুল হক বলেন, নিয়মিত পুলিশের বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে সন্ত্রাসবিরোধী মামলার ৩ আসামিসহ মোট ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের সবাইকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।



সাইবার নিরাপত্তায় পিছিয়ে অধিকাংশ ব্যাংক

অপরাধচিত্র প্রতিবেদক : ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবার পরিধি বাড়লেও গ্রাহকসেবামূলক অ্যাপের সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পিছিয়ে রয়েছে দেশের অধিকাংশ ব্যাংক। সাইবার হামলা বা তথ্য চুরির ঘটনা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির ঘাটতি রয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠানে। জরিপে অংশ নেওয়া ব্যাংকগুলোর মাত্র ৩১ শতাংশের রয়েছে নিয়মিত পরীক্ষা করা লিখিত নিরাপত্তা পরিকল্পনা। এ ছাড়া মাত্র ৪৪ শতাংশ ব্যাংক তাদের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (এপিআই) ব্যবহার রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ করে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) এক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। গত ১১ নভেম্বর বুধবার রাজধানীর মিরপুরে বিআইবিএম অডিটোরিয়ামে 'ব্যাংকিং অ্যাপস সিকিউরিটি ইন বাংলাদেশ: কারেন্ট স্ট্যাটাস অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় গবেষণার ফলাফল তুলে ধরা হয়।

গবেষণায় বলা হয়েছে, ৮১ শতাংশ ব্যাংকে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনার তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা (ইভেন্ট লগিং) রয়েছে। তবে ফিশিং, সামাজিক প্রকৌশলভিত্তিক প্রতারণা, গ্রাহকের হিসাব দখল এবং পাসওয়ার্ড চুরির মতো সাইবার অপরাধ ব্যাংকগুলোর জন্য বড় ঝুঁকি হয়ে উঠেছে। এসব প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম থাকলেও গ্রাহকের আচরণে এর প্রকৃত প্রভাব কতটা পড়ছে, তা পরিমাপের উদ্যোগ কম।

গ্রাহকের পরিচয় যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও রয়েছে দুর্বলতা। জরিপে অংশ নেওয়া ৭৮ শতাংশ ব্যাংকে নির্দিষ্ট যন্ত্রের সঙ্গে গ্রাহকের হিসাব যুক্ত রাখা এবং পুনরায় পরিচয় যাচাইয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে গ্রাহকের ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনায় পরিচয় যাচাইয়ের পদ্ধতি পরিবর্তনের সক্ষমতা রয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ ব্যাংকের। অর্থাৎ অধিকাংশ ব্যাংক এখনো ঝুঁকিভিত্তিক পরিচয় যাচাই পদ্ধতি ব্যবহারে পিছিয়ে রয়েছে।

ফিশিং, সামাজিক প্রকৌশলভিত্তিক প্রতারণা, গ্রাহকের হিসাব দখল এবং পাসওয়ার্ড চুরির মতো সাইবার অপরাধ ব্যাংকগুলোর জন্য বড় ঝুঁকি হয়ে উঠেছে। এসব প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম থাকলেও গ্রাহকের আচরণে এর প্রকৃত প্রভাব কতটা পড়ছে, তা পরিমাপের উদ্যোগ কম



তৃতীয় পক্ষের প্রযুক্তি সেবাদাতাদের নিরাপত্তা তদারকিতেও ঘাটতি রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ৭৮ শতাংশ ব্যাংক অন্তত একটি তৃতীয় পক্ষের তৈরি অ্যাপ ব্যবহার করে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের এপিআইয়ের নিরাপত্তাঝুঁকি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে মাত্র ৩৪ শতাংশ ব্যাংক। ফলে ব্যাংকের নিজস্ব নিরাপত্তাব্যবস্থার পাশাপাশি বাইরের প্রযুক্তি সেবাদাতাদের মাধ্যমে সাইবার ঝুঁকি তৈরির আশঙ্কাও থাকছে।

সাইবার নিরাপত্তা জোরদারে বাজেট ও দক্ষ জনবলের সংকটকেও বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছে ব্যাংকগুলো। জরিপে অংশ নেওয়া ৪৭ শতাংশ ব্যাংক বাজেটের সীমাবদ্ধতা এবং সমানসংখ্যক ব্যাংক প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সরঞ্জামের অভাবের কথা জানিয়েছে। এ ছাড়া ৩৮ শতাংশ ব্যাংক দক্ষ সাইবার নিরাপত্তা জনবল না থাকাকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

বিআইবিএমের গবেষণার প্রাথমিক জরিপে ৩৪টি ব্যাংক অংশ নেয়। তবে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন এবং নির্দিষ্ট সময়ের তথ্যের ভিত্তিতে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। এ কারণে এর ফলাফলকে পুরো ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক চিত্র হিসেবে বিবেচনা না করার বিষয়টিও গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিআইবিএম নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মো. হাবিবুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইবিএমের গবেষণা, উন্নয়ন ও কনসালটেন্সি বিভাগের পরিচালক অধ্যাপক মো. শিহাব উদ্দিন খান। সভাপতিত্ব করেন বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. মো. এজাজুল ইসলাম।

গবেষণার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইবিএমের প্রভাষক ফাহাদ আহমেদ। গবেষণা দলের অন্য সদস্য ছিলেন অধ্যাপক মো. শিহাব উদ্দিন খান এবং ইস্টার্ন ব্যাংকের প্রধান তথ্য নিরাপত্তা কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ।

সমাপনী বক্তব্যে ড. মো. এজাজুল ইসলাম ব্যাংকগুলোর সাইবার নিরাপত্তা জোরদারে নিয়মিত যৌথ নিরাপত্তা মহড়া, জালিয়াতির অভিযোগ জানানোর সহজ ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী গ্রাহক পরিচয় যাচাই পদ্ধতি চালুর ওপর গুরুত্ব দেন। পাশাপাশি তৃতীয় পক্ষের প্রযুক্তি সেবাদাতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষ জনবল তৈরির পরামর্শ দেন তিনি।

তিনি বলেন, নিরাপত্তা মহড়ায় যেসব দুর্বলতা শনাক্ত হবে, সেগুলো কত দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে, তা নিয়মিত পরিমাপ করতে হবে। একইভাবে গ্রাহকের কাছ থেকে জালিয়াতির অভিযোগ পাওয়ার পর কত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, সেটিও নজরদারির আওতায় আনতে হবে।

নৌকার মনোনয়নপত্র কিনলেও এখন ব্যবহার করছেন বিএনপির সাইনবোর্ড

রাজউকের কোটিপতি পিওন মোশারফ হোসেন



রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) মতো দেশের নগর পরিকল্পনা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সংস্থায় দুর্নীতি, জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ যেন থামছেই না। আবাসন ও ভবনের নকশা অনুমোদনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবা নিতে এসে সাধারণ মানুষকে যেখানে পদে পদে হয়রানি, ঘুষ ও অনিয়মের অভিযোগ মোকাবিলা করতে হয়, সেখানে সংস্থাটিরই একাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছে অনিয়মের শক্তিশালী বলয়। ফাইল গায়েব, নকশা অনুমোদনে ঘুষ গ্রহণ এবং আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনায় রয়েছে।

এবার সেই অভিযোগের তালিকায় নতুন করে আলোচনায় এসেছেন রাজউকের তৃতীয় শ্রেণির অফিস সহকারী মোশারফ হোসেন স্কাই। অভিযোগের বর্ণনা অনুযায়ী, নাম পরিবর্তন, শিক্ষাগত সনদসংক্রান্ত জটিলতা, পুলিশের চাকরিতে নিয়োগ ও পরবর্তী চাকরিচ্যুতির ঘটনা পেরিয়ে কীভাবে তিনি রাজউকে চাকরি পেলেন, তা নিয়ে উঠেছে গুরুতর প্রশ্ন। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয়, সরকারি চাকরিতে থাকা অবস্থায় ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাবনা-১ আসনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের মনোনয়নপত্র কেনার ঘটনাও সামনে এসেছে। একজন সরকারি কর্মচারীর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও মনোনয়ন কেনার বিষয়টি নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

নাম পরিবর্তন থেকে চাকরিতে জালিয়াতির অভিযোগ : সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি, মোশারফ হোসেন স্কাইয়ের প্রকৃত নাম মাহবুবুল হক স্কাই। ১৯৮৫ সালে পাবনার সাঁথিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সময় তিন বছরের জন্য বহিষ্কৃত হওয়ার পর নিজের পরিচয় আড়াল করতে তিনি নাম পরিবর্তন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এরপর মোশারফ হোসেন স্কাই পরিচয়ে জালিয়াতির পথে এগিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে।

অভিযোগের আরও গুরুতর অংশ হলো, ২০০০ সালে ভুয়া শিক্ষাগত সনদের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) পদে চাকরি নেন তিনি। পরবর্তী সময়ে সনদ জালিয়াতির বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশের চাকরিতে সনদ জালিয়াতির অভিযোগে চাকরিচ্যুত হওয়ার পরও কীভাবে একই ধরনের তথ্য গোপন করে ২০০১ সালের জুলাই মাসে রাজউকের অফিস সহকারী পদে যোগদানের সুযোগ পেলেন তিনি?

একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের আগে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিচয় ও পূর্ববর্তী চাকরির ইতিহাস যাচাই করার বাধ্যবাধকতা থাকার কথা। তাহলে মোশারফের ক্ষেত্রে সেই যাচাই কতটা কার্যকর ছিল? তাঁর নিয়োগের সময় দাখিল করা সনদ ও পরিচয়সংক্রান্ত নথি যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা জরুরি।

কল্যাণপুরের ফ্ল্যাট থেকে ধানমন্ডির বিলাসবহুল আবাসন : চাকরিতে যোগদানের পর থেকেই মোশারফ হোসেন স্কাইয়ের সম্পদ অর্জন নিয়ে নানা আলোচনা ও অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করে। অভিযোগ রয়েছে, প্রথমদিকে মিরপুরের কল্যাণপুর এলাকায় একটি ফ্ল্যাটের মালিক হন তিনি। পরবর্তী সময়ে সেই ফ্ল্যাট বিক্রি করে রাজধানীর অভিজাত এলাকা ধানমন্ডিতে বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের মালিকানা অর্জন করেন এবং সেখানে বসবাস শুরু করেন।

একজন তৃতীয় শ্রেণির সরকারি কর্মচারীর বৈধ আয়, চাকরির বেতন ও পরিচিত আর্থিক উৎসের সঙ্গে তাঁর সম্পদের সামঞ্জস্য কতটুকু–এ প্রশ্ন এখন সামনে আসছে। কল্যাণপুরের ফ্ল্যাট কীভাবে অর্জিত হয়েছিল, সেটি বিক্রির অর্থ কোথায় বিনিয়োগ করা হয়েছে এবং ধানমন্ডির ফ্ল্যাট কেনার অর্থের উৎস কী, এসব বিষয় নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধানের দাবি রাখে।

তবে এসব সম্পদের মালিকানা, ক্রয়মূল্য, অর্থের উৎস ও আয়কর নথি যাচাই ছাড়া অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট দলিল, ব্যাংক হিসাব, আয়কর বিবরণী ও সম্পদ বিবরণীর সমন্বিত অনুসন্ধান।

সরকারি চাকরিতে থেকেও নৌকার মনোনয়ন কেনার ঘটনা : মোশারফ হোসেন স্কাইকে ঘিরে সবচেয়ে আলোচিত ও প্রশ্নবিদ্ধ ঘটনাগুলোর একটি হলো তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতা। অভিযোগ অনুযায়ী, রাজউকের সরকারি চাকরিতে থাকা অবস্থায় তিনি সরাসরি দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। এমনকি ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পাবনা-১ আসনে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের মনোনয়নপত্রও কেনেন।

একজন সরকারি কর্মচারী কীভাবে দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হলেন? সরকারি চাকরির বিধিবিধানের সঙ্গে তাঁর এ ধরনের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কোনো সংঘাত তৈরি হয়েছিল কি না? মনোনয়নপত্র কেনার ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা প্রশাসনিক কোনো ব্যাখ্যা ছিল কি না–এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া জরুরি।

সরকারি চাকরিতে থেকে রাজনৈতিক পরিচয় ও প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ সত্য হলে তা শুধু ব্যক্তিগত আচরণের বিষয় নয়; এটি সরকারি কর্মচারীদের আচরণবিধি এবং প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার প্রশ্নও সামনে নিয়ে আসে।

রাজউকের নজরদারি কোথায়? রাজউকের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মচারীর নিয়োগসংক্রান্ত তথ্য, শিক্ষাগত সনদ, পূর্ববর্তী চাকরির ইতিহাস এবং সম্পদের হিসাব নিয়মিত যাচাই হওয়ার কথা। অথচ এতসব অভিযোগ ও প্রশ্ন সামনে আসার পরও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যকর প্রশাসনিক অনুসন্ধান হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

একজন কর্মচারীর বিরুদ্ধে শিক্ষাগত সনদ জালিয়াতি, পূর্ববর্তী চাকরিতে অনিয়ম, সম্পদের অসংগতি এবং সরকারি চাকরিতে থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠলে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো নিরপেক্ষভাবে বিষয়গুলো যাচাই করা। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য ও নথির ভিত্তিতে বিষয়টি পরিষ্কার করা জরুরি।

নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি : রাজউকের দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগের লাগাম টানতে হলে শুধু লোকদেখানো প্রশাসনিক পদক্ষেপে কাজ হবে না। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, জাতীয় পরিচয়পত্র, নিয়োগসংক্রান্ত নথি ও চাকরিতে যোগদানের আগের ইতিহাস ডিজিটাল ডেটাবেজের মাধ্যমে পুনরায় যাচাই করা প্রয়োজন। পাশাপাশি সরকারি বিধিমালা অনুযায়ী সম্পদের হিসাব গ্রহণ, আয় ও সম্পদের সামঞ্জস্য পরীক্ষা এবং প্রয়োজন অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান পরিচালনা করা জরুরি।

একই সঙ্গে প্লটের ফাইল, ভবনের নকশা অনুমোদন ও অন্যান্য সেবার পুরো প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজড করা, একই জোনে দীর্ঘদিনের পদায়ন বন্ধ এবং অভিযোগের দ্রুত বিভাগীয় তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে।

মোশারফ হোসেন স্কাইয়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর সত্যতা যাচাইয়ে রাজউক কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যকর ভূমিকা এখন সময়ের দাবি। বিশেষ করে তাঁর প্রকৃত পরিচয়, শিক্ষাগত সনদ, পুলিশের চাকরিতে নিয়োগ ও চাকরিচ্যুতির নথি, রাজউকে নিয়োগের বৈধতা, সম্পদের উৎস এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড–প্রতিটি বিষয় পৃথকভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন।

অভিযোগের সত্যতা থাকলে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। আর অভিযোগের অসত্যতা থাকলে সেটিও নথিপত্রের মাধ্যমে পরিষ্কার করা জরুরি এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন রাজউক সংশ্লিষ্টরা।

তিতাস সাবরেজিস্ট্রি অফিসে সিন্ডিকেটে জিম্মি সেবাপ্রত্যাশী

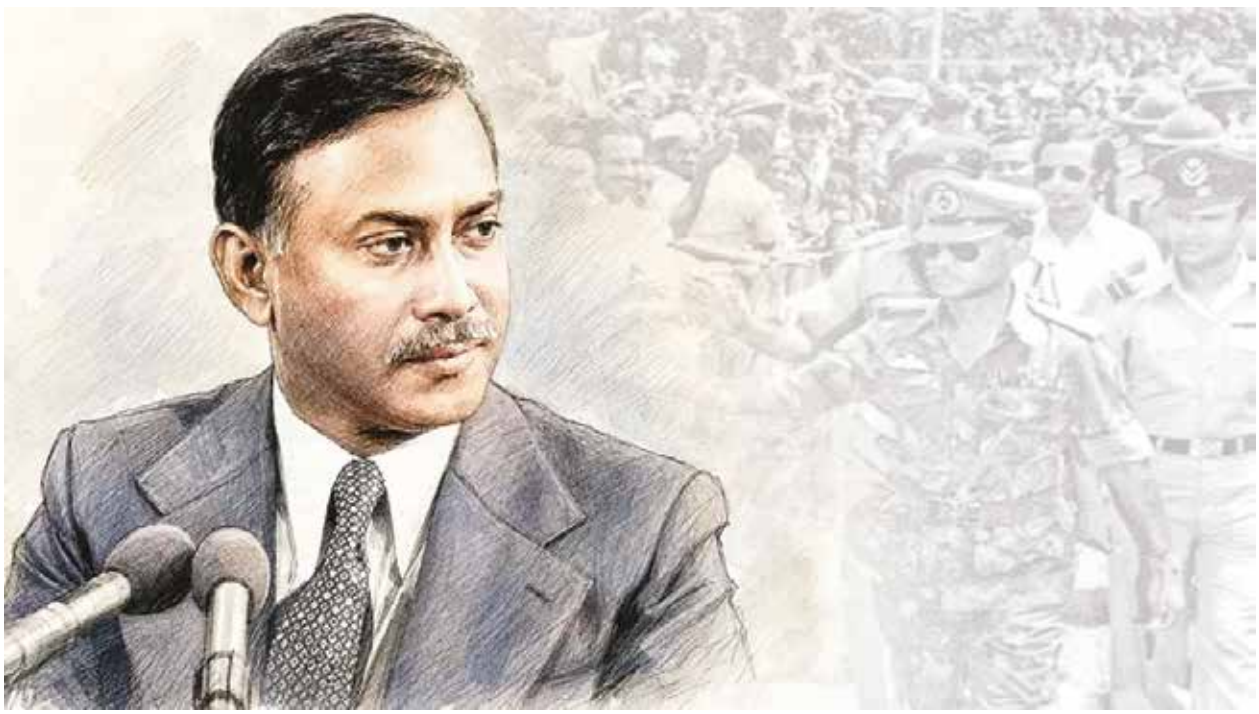
অপরাধচিত্র প্রতিবেদক: কুমিল্লার তিতাস উপজেলা সাবরেজিস্ট্রি অফিসে একটি সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছেন সেবাপ্রত্যাশীরা। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও দলিল লেখক সমিতির সভাপতি মো. মেহেদী হাসান ভূঁইয়া সেলিমের নেতৃত্বে এ সিন্ডিকেট পরিচালিত হচ্ছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, তিতাস উপজেলা সাবরেজিস্ট্রি অফিসে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান ভূঁইয়া সেলিম বেশ কিছু সহকারীকে নিয়ে সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন। এ বলয়ে সক্রিয় রয়েছেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সেলিম মোল্লা, কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন প্রধান, সহ-কোষাধ্যক্ষ আল আমিন সরকার, শ্রমবিষয়ক সম্পাদক মাহবুব আলম সরকার, জিয়ারকান্দি ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলী হোসেন এবং বলরামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নুর আলম।

অফিস সূত্র জানায়, সেলিম সিন্ডিকেটের সদস্যরা প্রায়ই ত্রুটিপূর্ণ কাগজপত্র, ডিসিআরবিহীন এবং নানা অসঙ্গতিপূর্ণ দলিল সাবরেজিস্ট্রারের দপ্তরে নিয়ে আসেন। নিয়মিত নিয়মবহির্ভূত এসব দলিল সম্পাদনের জন্য তারা সাবরেজিস্ট্রারকে নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করেন। সাধারণ সেবাপ্রত্যাশীদের বাধ্য করা হয় তাদের মাধ্যমে দলিল সম্পাদনে। তাছাড়া মূল্যবান জমি ক্রয়-বিক্রয়েও তারা মুনাফা হাতিয়ে নেন। সম্প্রতি মজিদপুর ইউনিয়নের মৌটুপী গ্রামের বাসিন্দা সহিদ শিকদার ৭১ লাখ টাকার একটি জমি বিক্রির জন্য তিতাস উপজেলা সাবরেজিস্ট্রি অফিসে যান। কিন্তু সেখানে গিয়ে জমির দলিল সম্পাদন ও বিক্রিতে সরাসরি বাধা দেন সেলিম এবং মজিদপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাজেদুল ইসলাম মন্টু। অভিযোগ রয়েছে-তারা জমিটি অর্ধেক মূল্যে নিজেদের কব্জায় নিয়ে মুনাফা হাতিয়ে নেওয়ার পাঁয়তারা করেছিলেন। পরে ওই মালিকের জমি বিক্রি থমকে যায়। সাবরেজিস্ট্রার তখন নিয়ম রক্ষার খাতিরে এক সপ্তাহ সময় দেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিন্ডিকেট ওই জমি কিনতে ব্যর্থ হলে সাবরেজিস্ট্রার বিধি মোতাবেক দলিল করে দেন। এ ঘটনায় সাবরেজিস্ট্রারের ওপর চওড়া হন সেলিম।

গত ২৮ অক্টোবর তিতাস উপজেলা মাসিক আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। সভায় সাবরেজিস্ট্রার মো. শরিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলে দলিল লেখক সমিতির সভাপতি ও বিএনপি নেতা সেলিম বলেন, সাবরেজিস্ট্রারকে কম্পিউটার কিনে না দেওয়ায় দুই সপ্তাহ ধরে দলিল রেজিস্ট্রি বন্ধ রাখা হয়েছে। এছাড়া তিনি সপ্তাহে মাত্র দুদিন দায়িত্ব পালন করেন, অতিরিক্ত টাকা দাবি করেন এবং ১২টার আগে এজলাসে ওঠেন না। দলিল লেখকরা প্রতিবাদ করলে তাদের লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এ সময় তিনি সাবরেজিস্ট্রারকে 'ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলের চরিত্র' বলে উল্লেখ করেন।

তবে এসব অভিযোগ সরাসরি নাকচ করে সাবরেজিস্ট্রার মো. শরিফুল ইসলাম জানান, উপজেলা বিএনপির শীর্ষস্থানীয় পাঁচ-ছয়জন নেতাই আমার নিবন্ধিত দলিল লেখক। তিনি বলেন, 'তারা প্রায়ই ত্রুটিযুক্ত ও ডিসিআরবিহীন দলিল নিয়ে আসেন। মৌটুপীর সহিদ শিকদারের ৭১ লাখ টাকার জমিটি কম দামে ক্রয় করতে তারা বাধা দিয়েছিল। আমি আইনসম্মতভাবে দলিল সম্পাদন করে দেওয়ায় তারা আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছে এবং আমাকে আওয়ামী লীগ ট্যাগ দিয়ে হুমকি দিচ্ছে। পুরো অফিস সেলিম এবং তার লোকজন নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, এর আগে স্ট্যাম্প ভেন্ডার সেলিম মোল্লা সিরিয়াল ছাড়া দলিল সাবমিটের চেষ্টা করেন। তিনি একজন স্ট্যাম্প ভেন্ডার, অন্যের নামে দলিল সাবমিট করতে আসেন তার মধ্যে সিরিয়াল ছাড়া। আমি কিভাবে তা গ্রহণ করি? এতে তিনিও ক্ষুব্ধ হন। সেলিম বলেন, 'আমি দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো অনৈতিক প্রভাব বিস্তার করি না। এখানে আমাদের কোনো সিন্ডিকেট নেই। সাবরেজিস্ট্রার নিজের দুর্নীতি ও অপকর্ম ঢাকতে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বক্তব্য দিচ্ছেন। সাবরেজিস্ট্রার সেবাপ্রত্যাশীদের জিম্মি করে গত দুই বছরে কয়েক কোটি টাকা ঘুস নিয়েছেন। তাছাড়া সেরেস্তার নামে তিনি নিয়মিত ঘুস নিচ্ছেন।' এ অবস্থায় স্থানীয় সচেতন মহল ও ভুক্তভোগী সেবাপ্রত্যাশীরা তদন্তসাপেক্ষে তিতাস সাবরেজিস্ট্রি অফিসে জনদুর্ভোগ ও সিন্ডিকেটের রাজত্ব বন্ধে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।



আধুনিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন ও জিয়াউর রহমান

সুশীল বড়ুয়া



জিয়ার রাষ্ট্রচিন্তা ছিল স্বচ্ছ এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত। বাংলাদেশকে আধুনিক জাতি রাষ্ট্রে (নেশন স্টেট) রূপান্তরিত করতে হলে প্রথম দরকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মাধ্যমে তিনি তা প্রতিষ্ঠা করেন

যুগে যুগে এমন কিছু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জন্ম হয়, যারা দেশ-কাল পেরিয়ে বিশ্বদরবারে কর্মগুণে নিজ অবস্থান স্থায়ী করে নেন। তেমনি একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ জিয়াউর রহমান। জন্ম ১৯৩৬ সালে জানুয়ারি মাসে। পিতার নাম মনছুর রহমান। পেশায় রসায়নবিদ। কর্মসূত্রে কলকাতায় বসবাস এবং অবিভক্ত ভারত সরকারের কর্মকর্তা। জিয়াউর রহমানের লেখাপড়ার হাতেখড়ি কলকাতার বিখ্যাত 'হেয়ার স্কুল'-এ। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই বয়েজ স্কুলে লেখাপড়া করেন। হেয়ার স্কুলে পড়ার সময় জিয়াউর রহমানের শিশু মনে ব্যাপক রেখাপাত করেন দুজন রাজনৈতিক নেতা। তারা হলেন নেতাজী সুভাষ বসু এবং মহাত্মা গান্ধী। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর জিয়াউর রহমানের পরিবার পাকিস্তানে চলে আসে। পিতার কর্মসূত্রে করাচিতে নতুন জীবন শুরু করেন তারা। করাচি ডি জে কলেজে শিক্ষাজীবন নতুনভাবে শুরু করেন জিয়াউর রহমান। পরে তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে কমিশন্ড অফিসার হিসেবে যোগ দেন। করাচির কাকুল মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষণকালে পাকিস্তানের দুই প্রদেশে বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ববাংলার মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য তার মনে গভীরভাবে ক্ষত সৃষ্টি করে। তিনি দেখতে পান পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কীভাবে পূর্ববাংলাকে অর্থনৈতিক বৈষম্যের মাধ্যমে শোষণ করছে। ১৯৫৫ সালে সর্বোচ্চ টেন পার্সেন্ট নিয়ে তিনি সেনাবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হন, যা ছিল বিরল। সেনাবাহিনীতে পূর্ববাংলা আর পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্য দূর করার মানসে তিনি বাঙালি যুবকদের উদ্বুদ্ধ করতেন সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীতে বাঙালি সেনা এবং অফিসারদের রোল মডেল। মেজর পদে উন্নীত হওয়ার পর তাকে অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টে বদলি করা হয়, প্রথমে জয়দেবপুরে পরে চট্টগ্রামে।

১৯৭১ সালে আমি চট্টগ্রাম কলেজে অধ্যয়নরত এবং আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ও সংগঠক। উত্তাল ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় মিছিল নিয়ে বের হই। গোটা চট্টগ্রামবাসীর গন্তব্য হলো বন্দরের দিকে। আমরা সবাই মিছিল নিয়ে আগ্রাবাদ হয়ে বন্দরের ১ নম্বর গেটের কাছাকাছি অবস্থান করছি। চট্টগ্রাম শহরের সব রাস্তাঘাট বেরিক্যাড দিয়ে যান চলাচল প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। রাতে আমরা চট্টগ্রাম কলেজ হোস্টেলে ফিরে আসি। ২৫ মার্চ লালদিঘি মাঠে জনসভায়

নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দিয়ে প্রত্যেক নেতাকর্মীকে বলেন নিজ নিজ এলাকায় যেতে। গিয়ে জনগণকে সংগঠিত করে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেন নেতারা। রাতে হোস্টেলে খবর এলো মেজর জিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার ট্রুপ নিয়ে অস্ত্র খালাস না করে ফেরত গেছেন। এ খবরে হোস্টেলে সব ছাত্রের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

২৫ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা শুরু করে রাত ১১টার পর থেকে। যত সহজে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়, রাজারবাগসহ পুরো ঢাকা শহরকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিল, চট্টগ্রামে তাদের দ্বারা তা সম্ভব হয়নি। এর পুরো কৃতিত্বের দাবিদার চট্টগ্রামের বাঙালি সেনা অফিসাররা। মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ফেরত এসে প্রথম যে কাজটি করেন, তা হলো তার কমান্ডার জানজুয়াকে গ্রেপ্তার করে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পুরো বাহিনী নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে আসা।

২৬ মার্চ দুপুরে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা কয়েকজন বেতারকর্মীর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বেতার চালু করতে সমর্থ হন। তারা দুপুরে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র চালু করে পরিকল্পনাহীনভাবে বক্তব্য প্রচার করেন প্রথম অধিবেশনে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো বেতার কেন্দ্র থেকে কোনো দিকনির্দেশনা দেননি চট্টগ্রামের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। বিশেষ করে এমএনএ ও এমপি এবং আওয়ামী লীগের প্রথম শ্রেণির নেতারা তখনো বিশ্বাস করতে পারছিলেন না পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণ আর একসঙ্গে থাকতে পারবে না। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অনুরোধ করেন বেতারে ঘোষণা দিয়ে জনগণকে নির্দেশনা দেওয়ার। কিন্তু কেউ ভয়ে রাজি হননি। ২৭ মার্চ সন্ধ্যা ৭টার দিকে কালুরঘাট বেতার থেকে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম প্রচার করা হয়। তার ঘোষণা প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিকামী জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। আন্দোলনরত জনগণ স্বাধীনতার দিকনির্দেশনা পেয়ে পূর্ণ উদ্যমে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এই কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, ২৫ মার্চ যেখানে আন্দোলনরত জনগণকে আওয়ামী লীগ নেতারা কোনো দিকনির্দেশনা দিতে পারেননি, সেখান থেকে জিয়াউর রহমানের উত্থান শুরু হয়। তিনিই



২৬ মার্চ দুপুরে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা কয়েকজন বেতারকর্মীর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বেতার চালু করতে সমর্থ হন। তারা দুপুরে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র চালু করে পরিকল্পনাহীনভাবে বক্তব্য প্রচার করেন প্রথম অধিবেশনে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো বেতার কেন্দ্র থেকে কোনো দিকনির্দেশনা দেননি চট্টগ্রামের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। ২৭ মার্চ সন্ধ্যা ৭টার দিকে কালুরঘাট বেতার থেকে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম প্রচার করা হয়

ঘোষণা করেন বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। বিশ্ব মানচিত্রে নতুন দেশের উদয় হয়েছে। তার রাজনৈতিক উত্থান হলো অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনার মধ্যদিয়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনিই একমাত্র অকুতোভয় কিংবদন্তিতুল্য বীর, যিনি সময়কে ধারণ করতে পেরেছিলেন এবং সঠিক সময়ে সঠিক দিকনির্দেশনা দেশবাসীকে দিতে পেরেছিলেন।

দেশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য শিল্প বিকাশের পরিকল্পনা হাতে নেন তিনি। তিনি মনে করেন বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। তাই শ্রমঘন গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক পলিসি হাতে নিয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। গার্মেন্টস শিল্পের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য শ্রমিক এবং গার্মেন্টস প্রশাসনের ব্যবস্থাপনার লোক পাঠিয়ে দক্ষ জনবল গড়ে তোলেন এবং গার্মেন্টস শিল্পের ভিত্তি রচনা করেন। আজ বাংলাদেশ হলো বিশ্বে তৃতীয় সর্বোচ্চ গার্মেন্টস রপ্তানিকারী দেশ। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান খাত হলো গার্মেন্টস শিল্প। গ্রামীণ অর্থনীতিকে বিকশিত করার জন্য পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড গঠন করে গ্রামীণ পর্যায়ে বিদ্যুতের সুযোগ বৃদ্ধি করেন।

আধুনিক জাতি (নেশন স্টেট) রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ হলো তার শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনী। জিয়া সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে কঠোর হাতে বিশৃঙ্খলা দমন করেন এবং সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন, যা আজ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

১৯৭৬ সালে শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশ ও মানস গঠনের নিমিত্তে শিশু একাডেমি এবং স্বাধীন সংস্কৃতি বিকাশে তিনি বিটিভিতে নতুন কুঁড়ি প্রতিযোগিতা চালু করেন। ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক 'একুশে পদক' চালু হলো। ১৯৭৭ সালে বেসরকারি প্রথম সর্বোচ্চ স্বাধীনতা পদক চালু করে তিনি রাষ্ট্র মেধাবী, জ্ঞানী ও স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য স্বাধীনতা পদক চালু করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি সরকারিভাবে একুশে বইমেলা চালু করেন বাংলা একাডেমি এবং বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থাগুলোর যৌথ উদ্যোগে।

জিয়ার রাষ্ট্রচিন্তা ছিল স্বচ্ছ এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত। বাংলাদেশকে আধুনিক জাতি রাষ্ট্রে (নেশন স্টেট) রূপান্তরিত করতে হলে প্রথম দরকার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মাধ্যমে তিনি তা প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সব জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদকে সাংবিধানিকভাবে গ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবন থেকে রাজনৈতিক মানস গঠন পর্যন্ত তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ রেখে যান, জাতি গঠনে তার রাজনৈতিক চিন্তা ছিল রাষ্ট্রনায়কসুলভ। তাকে বাংলাদেশ নামক আধুনিক জাতি রাষ্ট্রের (নেশন স্টেট) জনক হিসেবে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না।

লেখক: *বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য*





রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা উন্নয়নে অন্তরায়

মো. চুন্নু চৌধুরী

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া উন্নয়ন শুধুমাত্র মরীচিকা, একটি শূন্য প্রতিশ্রুতি। তাই দেশ এবং জাতির স্বার্থে, প্রতিপক্ষের ধ্বংসে নয়, রাষ্ট্রের নির্মাণে মনোনিবেশ করা উচিত। প্রতিহিংসার গণ্ডি ভেঙে, টেকসই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ টেকসই উন্নয়ন কোনো দলের নয়, এটি পুরো জাতি এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রশ্ন

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা শুধুমাত্র একটি সমস্যা নয়, এটি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এক গভীর অন্তর্ঘাত। যখন রাজনীতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তখন উন্নয়নও পথ হারায়। রাষ্ট্রযন্ত্র বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, প্রশাসন ভেঙে যায় এবং জাতীয় অগ্রগতি থমকে দাঁড়ায়। টেকসই উন্নয়ন কোনো ফাঁপা স্লোগান নয়, এটি একটি রাষ্ট্রের আত্মার সন্ধান। কিন্তু সেই আত্মা যদি রাজনৈতিক অস্থিরতার দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তবে উন্নয়নের শরীরে শুধু পোড়া দাগই থেকে যায়।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা মূলত টেকসই উন্নয়নের শিরদাঁড়া। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন নীতি নয়, বরং অর্থনীতি, সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার গভীরে প্রোথিত একটি কাঠামো, যার ওপর দাঁড়িয়ে একটি জাতির অগ্রগতি নির্ভর করে। বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনীতির ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা শুধু উন্নয়নের সহায়ক উপাদান নয়, এটি উন্নয়নের পূর্বশর্ত। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা উপেক্ষা করে উন্নয়নকে কল্পনা করা মানে মরুভূমিতে বীজ বপন করার মতো, যেখানে চমৎকার স্বপ্ন হলেও বাস্তবতা শূন্য।

যে জাতির রাজনীতিতে ভারসাম্য নেই, সেখানে টেকসই উন্নয়ন কেবল কাগজে আঁকা নকশা, যার ভিত্তি অস্থিরতায় নিমজ্জিত। টেকসই উন্নয়ন মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভাবনা ও বর্তমানের অগ্রগতির মধ্যে এক সুষম ভারসাম্য, যেখানে অর্থনীতি, সমাজ এবং পরিবেশ একত্রে পথচলে। কিন্তু এই তিনটি স্তম্ভ যদি রাজনৈতিক অস্থিরতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে, তবে সেই উন্নয়ন হয় অন্তঃসারশূন্য, বহিরঙ্গ সাজসজ্জা মাত্র।

টেকসই উন্নয়ন কখনোই এককভাবে অর্থনীতি, সমাজ বা পরিবেশের উন্নয়ন নয়। বরং এটি এমন একটি কাঠামো, যা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর দাঁড়িয়ে সার্বিক উন্নতি সাধন করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বাস্তবতা নির্মমভাবে প্রকাশ পায়। একদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অশান্তি, ক্ষমতার লড়াই, এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা,



উন্নয়ন প্রকল্পগুলো দলীয় স্বার্থের বাইরে রেখে স্বাধীন প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে পরিচালিত করতে হবে। রাজনৈতিক পালাবদলের সময়ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ যেন অটুট থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকতে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরির জন্য স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে

অন্যদিকে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি।

রাজনৈতিক অস্থিরতার আসল মূল্য যে কতটা গভীর, তা অর্থনীতির প্রেক্ষাপট দিয়েই সহজে উপলব্ধি করা যায়। বাস্তবিক অর্থে, রাজনৈতিক অস্থিরতা হলো অর্থনৈতিক স্থবিরতা। যখন ক্ষমতা নিয়ে নিজেদের মধ্যে অন্তদ্বন্দ্ব চলতে থাকে, তখন ক্ষমতার টানাপড়েন এবং অনিশ্চয়তার শেকলে শিল্পাঞ্চল স্তব্ধ হয়ে যায়। বিনিয়োগকারীরা আস্থা হারায়, কেননা তারা জানে, এই অস্থিতিশীল দেশে বিনিয়োগ মানে অগ্নিকুণ্ডে অর্থ ঢালা।

মূলত রাজনৈতিক অস্থিরতা বৈদেশিক বাণিজ্যের শিরায় আঘাত হানে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ধুলিসাৎ হয়, ব্যবসায় আস্থার সংকট তৈরি হয়, কর্মসংস্থান কমে যায়, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার মন্থর হয়। ফলস্বরূপ, অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে। শুধু অর্থনীতিতেই নয়, শাসন ব্যবস্থায় অস্তিত্বসংকট এবং প্রশাসনিক পঙ্গুত্ব দেখা দেয়।

রাজনীতি যখন প্রশাসনের ওপর চেপে বসে, তখন প্রশাসনিক দক্ষতা পঙ্গু হয়ে যায়। দলীয়করণ প্রশাসনের স্বাধীনতাকে গলাটিপে ধরে। পুলিশ, বিচারব্যবস্থা, এবং প্রশাসন সবই এক অদৃশ্য সুতোর টানে পরিচালিত হতে থাকে। ফলে আইন হয় পক্ষপাতদুষ্ট, বিচার হয় রাজনৈতিক হাতিয়ার, আর শাসনব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায় নির্লজ্জ অনুগত্যের প্রতীক। এ অবস্থা সমাজ ও রাষ্ট্রে ভয়াবহ অসমতা, নির্বিচার ও অন্যায়ের দিকে নির্দেশ করে।

সবচেয়ে বড় বিষয় সামাজিক বিভাজন এবং মূল্যবোধের সংকট, যা উন্নয়নের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। কেননা টেকসই উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক সূচকের গল্প নয়; এটি ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং প্রজন্মান্তরে দায়বদ্ধতার সমন্বয়। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এই মূল্যবোধকে কর্পোরেট স্বার্থ বা গোষ্ঠীগত এজেন্ডার কাছে বন্ধক দেয়। ফলে প্রকৃত উন্নয়নের পরিবর্তে "উন্নয়নের মিথ" প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রকল্পের নামে সম্পদ পাচার বা পরিবেশ বিনাশ বৈধতা পায়।

শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সমাজের ভিতরে বৈষম্য সৃষ্টি করে, নাগরিকের আস্থার সংকট তৈরি হয়। স্বাভাবিকভাবেই নাগরিক এবং রাষ্ট্রের সম্পর্কের ভিত্তি যখন অনিশ্চয়তায় পরিণত হয়, তখন সমষ্টিগত উদ্যোগ ভেঙে পড়ে। এই অবস্থা চলতে থাকলে রাষ্ট্র ধ্বংসের অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত হবে।

তাই, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামো অপরিহার্য। রাজনীতি যেন জনগণের স্বার্থে পরিচালিত হয়, এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

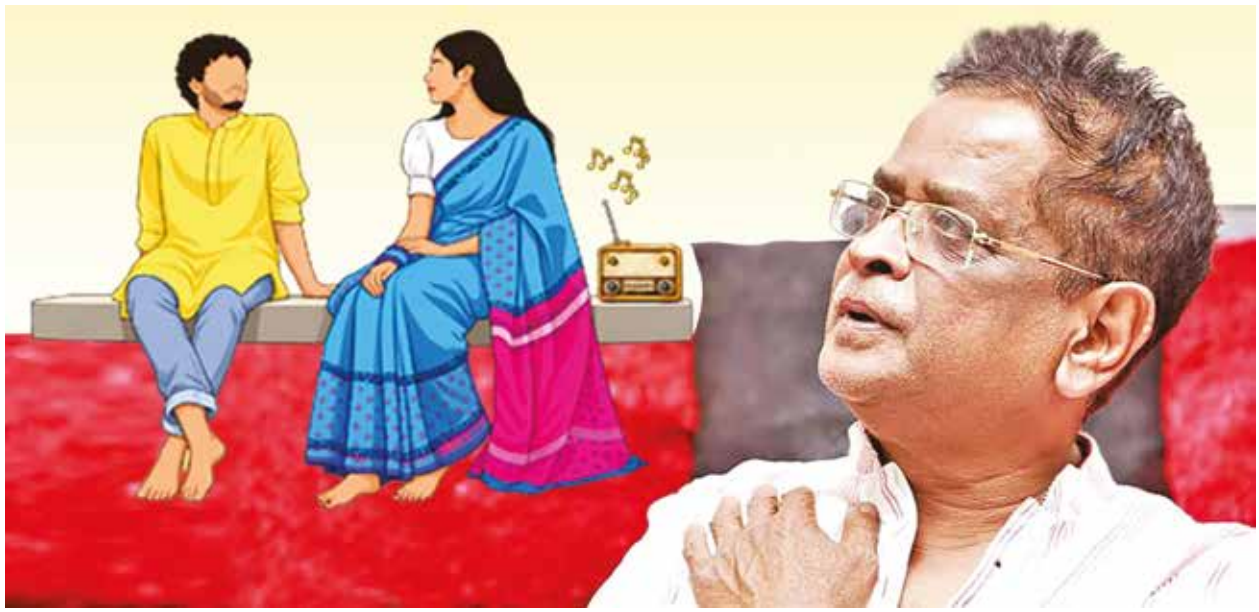
উন্নয়ন প্রকল্পগুলো দলীয় স্বার্থের বাইরে রেখে স্বাধীন প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে পরিচালিত করতে হবে। রাজনৈতিক পালাবদলের সময়ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ যেন অটুট থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকতে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরির জন্য স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। গবেষণামূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোতে গবেষণাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা দরকার, যাতে উন্নয়নে দ্রুত গতি প্রাপ্ত হয়।

সর্বোপরি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা টেকসই উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এটি শুধু সহিংসতা নয়, এটি রাষ্ট্রের আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করার একটি প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের রাজনীতি এবং উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়া একটি বুনন, যেখানে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি নতুন দিশারী গড়ে তুলতে পারে।

এই দেশটির জন্য উন্নয়ন যেন শুধু প্রতিশ্রুতিতেই আবদ্ধ না থেকে, উন্নয়ন এবং অগ্রগতির ধারা যেন দৃশ্যমান সাফল্যে রূপান্তরিত হয়। একমাত্র শক্তিশালী রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একসাথে মিলিত হলে, তা বাংলাদেশের প্রকৃত সমৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি হবে। কেননা, উন্নয়ন তখনই টেকসই হয়, যখন রাজনীতি তার দায়িত্বশীল অবস্থান গ্রহণ করে, প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে রাষ্ট্রের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ছাড়া উন্নয়ন শুধুমাত্র মরীচিকা, একটি শূন্য প্রতিশ্রুতি। তাই দেশ এবং জাতির স্বার্থে, প্রতিপক্ষের ধ্বংসে নয়, রাষ্ট্রের নির্মাণে মনোনিবেশ করা উচিত। প্রতিহিংসার গণ্ডি ভেঙে, টেকসই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। কারণ টেকসই উন্নয়ন কোনো দলের নয়, এটি পুরো জাতি এবং রাষ্ট্রের স্বার্থের প্রশ্ন।

লেখক : গণমাধ্যমকর্মী



হলুদ পাঞ্জাবি এবং হুমায়ূন আহমেদ

অপরাধচিত্র ডেস্ক : হলুদ পাঞ্জাবি পরে হিমুর উদ্দেশ্যহীন পথচলা, মিসির আলির যুক্তির জগৎ, রূপার অন্তহীন অপেক্ষা কিংবা বাকের ভাইয়ের করুণ পরিণতি–চরিত্রগুলো কাল্পনিক, অথচ আমাদের জীবনে তাদের উপস্থিতি আশ্চর্য রকম বাস্তব। বাংলা সাহিত্যে এমন এক জগৎ নির্মাণ করেছিলেন হুমায়ূন আহমেদ, যেখানে পাঠক শুধু গল্প পড়েন না, নিজের জীবনেরই কোনো অচেনা অংশ খুঁজে পান।

হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্ট চরিত্রগুলোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাদের অসম্পূর্ণতা। হিমু সমাজের প্রচলিত নিয়মের বাইরে বাঁচতে চায়। তার উদাসীনতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে মানুষের স্বাধীন হওয়ার গোপন আকাঙ্ক্ষা। অন্যদিকে মিসির আলি রহস্যের সমাধান খোঁজেন যুক্তি ও মনস্তত্ত্বের আলোয়। একই লেখকের সৃষ্টি এই দুই বিপরীত চরিত্র যেন মানুষের মনের দুই চিরন্তন প্রবণতা–বিশ্বাস করতে চাওয়া এবং সত্য জানতে চাওয়া।

রূপার ভালোবাসা আর অপেক্ষায় ফুটে ওঠে সম্পর্কের অনিশ্চয়তা। শুভ্রের সরলতায় ধরা দেয় জটিল পৃথিবীতে নিষ্কলুষ থাকার আকাঙ্ক্ষা। আর বাকের ভাই হয়ে ওঠেন প্রতিবাদ ও মানবিকতার প্রতীক। নব্বইয়ের দশকে 'কোথাও কেউ নেই' নাটকে তার মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে দর্শকদের প্রতিবাদ প্রমাণ করেছিল, কল্পনার মানুষও বাস্তব সমাজে কত গভীর আবেগ তৈরি করতে পারে। তবে হুমায়ূনের চরিত্রজগৎ শুধু এই পরিচিত মুখগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়। মুনা, রাবেয়া কিংবা রানুর মতো নারী চরিত্রের মধ্যেও তিনি তুলে ধরেছেন ভালোবাসা, সামাজিক চাপ, নিঃসঙ্গতা ও ব্যক্তিগত সংগ্রামের নানা মাত্রা।

তার লেখার জাদু ছিল আপাত সাধারণ ঘটনাকে অসাধারণ করে তোলার ক্ষমতায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছোটখাটো টানাপোড়েন, বৃষ্টিভেজা বিকেল, জ্যোৎস্নার রাত কিংবা দুজন মানুষের সামান্য কথোপকথন–তার কলমে এসবই হয়ে উঠত গভীর অনুভূতির গল্প। সহজ ভাষা, স্বাভাবিক সংলাপ, সূক্ষ্ম হাস্যরস আর হঠাৎ বিষাদের উপস্থিতি পাঠককে ধরে রাখত শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। তিনি সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন না; বরং কিছু অনুভূতি অসমাপ্ত রেখে দিতেন পাঠকের নিজের মতো করে বোঝার জন্য।

১৯৪৮ সালের ১৩ নভেম্বর জন্ম নেওয়া হুমায়ূন আহমেদ ১৯৭২ সালে 'নন্দিত নরকে' উপন্যাসের মাধ্যমে সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। এরপর উপন্যাস, নাটক ও চলচ্চিত্রে তৈরি করেন স্বতন্ত্র পরিচয়। 'এইসব দিনরাত্রি', 'বহুব্রীহি', 'অয়োময়' কিংবা 'কোথাও কেউ নেই' শুধু জনপ্রিয় টেলিভিশন নাটক ছিল না, হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্মৃতির অংশ। তার বিপুল জনপ্রিয়তার পাশাপাশি লেখার পুনরাবৃত্তি ও সাহিত্যিক গভীরতা নিয়েও সমালোচনা রয়েছে। তবু সাধারণ পাঠকের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক তৈরিতে তার অবদান অনস্বীকার্য।

হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যিক ছায়া খুঁজতে গেলে তাই শুধু তার ব্যক্তিজীবনে নয়, ফিরে তাকাতে হয় তার সৃষ্ট মানুষগুলোর দিকে। হিমুর স্বাধীনতা, মিসির আলির অনুসন্ধান, রূপার অপেক্ষা, শুভ্রের সরলতা কিংবা বাকের ভাইয়ের মানবিকতার মধ্যে ছড়িয়ে আছে মানুষের চিরচেনা আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব ও বেদনা। তিনি নিখুঁত মানুষ সৃষ্টি করেননি; সৃষ্টি করেছিলেন এমন মানুষ, যাদের ভুল, দুর্বলতা আর অপূর্ণতাই তাদের জীবন্ত করে তুলেছে।

২০১২ সালের ১৯ জুলাই তার জীবনাবসান হলেও পাঠকের সঙ্গে সেই চরিত্রগুলোর সম্পর্ক শেষ হয়নি। নতুন প্রজন্মের পাঠকের কাছেও তার গল্প ফিরে আসে নতুন অনুভূতি নিয়ে। কারণ হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য শুধু কাহিনির বিস্ময়ে টিকে নেই, টিকে আছে মানুষের সঙ্গে তার গভীর আত্মীয়তায়।

কিছু লেখক বইয়ের পাতায় থেকে যান, আর কেউ কেউ পাতার সীমানা পেরিয়ে মানুষের জীবনের অংশ হয়ে ওঠেন। হুমায়ূন আহমেদ সেই বিরল কথাশিল্পী, যিনি অসংখ্য চরিত্রের ভেতর দিয়ে নিজের এক অনন্য সাহিত্যিক পৃথিবী নির্মাণ করে গেছেন



লিটন দেওয়ান চিশ্তী

আপনার মুখ দেখেই বলে দিতে পারেন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

লিটন দেওয়ান চিশ্তী আধ্যাত্মিক সাধনায় চিশ্তীয়া তরিকার আলোয় নিজেকে আলোকিত করেছেন। ওলিকুলের শিরোমণি, উপমহাদেশের বিখ্যাত ওলি হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রহ.)-এর দরবার শরীফে যাওয়ার পর ২৩তম বংশধর আজমীর শরিফের বর্তমান পীর সাহেব হযরত সৈয়দ হাসনাইন চিশ্তী (রহ.)-এর নিকট থেকে খেলাফতপ্রাপ্ত হন এই লিটন দেওয়ান চিশ্তী।



আর হতাশা নয় সফলতার জন্য আসুন

রত্ন পাথর পরিধান করলে শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে, নারী পুরুষের যৌবন বৃদ্ধি, রোগ থেকে মুক্তি, স্কীনের লাবন্য বৃদ্ধি, বার্ধ্যকের ছাপ দূর করে। গোপন শুক্র থেকে মুক্ত হওয়া, দূর্বিপাক বিপদ-আপদ, মনের অশান্তি দূর করে, অর্থ সম্পদের সহায়ক, ব্যবসায়িক মন্দা দূর করে, জ্ঞান বৃদ্ধি, সন্তানের লেখাপড়ায় মনযোগী, দাম্পত্য কলহ দূর, বিবাহে বাধা, বান ফিরানো, স্বামীর পরকীয়া প্রেমের আসক্তি থেকে মুক্তি, জটিল মামলার সহজ সমাধান, বিদেশ যাত্রায় বাধা দূর হয় রত্ন পাথর ব্যবহারের মাধ্যমে। সব ধর্মের মানুষই রত্ন পাথর ব্যবহার করতে পারেন। অভিজ্ঞ জ্যোতিষের পরামর্শ ব্যাতিত রত্ন পাথর ধারন করবেন না। আপনার হাতের রত্ন পাথরটি সঠিক কিনা জেনে নিন। অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে সব ধরনের রত্ন পাথর পরীক্ষা করা হয়। রত্ন পাথর পরিধান করে সর্বপ্রথম নিজেকে পবিত্র রাখতে হবে। এখানে সকল প্রকার গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।



ভারতীয় বাংলা অভিনেতা বিপ্লব চ্যাটার্জি ও অরুন ব্যানার্জি এর নিকট থেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিখুঁত ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য পদক গ্রহন করছেন জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশ্তী।



কানাডা বিজনেস কাউন্সিল এর চেয়ারপার্সন ব্যারিষ্টার জেরজিনা বেনসিক এর নিকট হতে রত্ন বিশারদ হিসাবে সনদপত্র গ্রহন করছেন জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশ্তী।



ভারতীয় বাংলা অভিনেত্রী কৌশানি মুখার্জির নিকট থেকে জ্যোতিষ শাস্ত্রে নিখুঁত ভবিষ্যৎবাণী করার জন্য পদক গ্রহন করছেন জ্যোতিষরাজ লিটন দেওয়ান চিশ্তী।

মানবজীবনে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট, রত্ন পাথর ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে



(মঙ্গলবার সাপ্তাহিক বন্ধ)

আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন?

- দাম্পত্য কলহ দূর
- ব্যবসা বানিজ্যে লোকশান
- গোপন শত্রু থেকে মুক্ত হওয়া
- শনি ও রাহুর গ্রাস এ ভুগছেন?
- স্বামীর পরকীয়া প্রেমের আসক্তি থেকে মুক্তি
- বিদেশ যাত্রায় বাধা
- যাদুটোনা-বান থেকে মুক্তি
- জটিল মামলার সহজ সমাধান
- নারী পুরুষের যৌবন বৃদ্ধি

অভিজ্ঞ জ্যোতিষের পরামর্শ নিয়ে খাঁটি রত্ন পাথর ব্যবহার করুন, সুখী-সুন্দর ও সমৃদ্ধ জীবন গড়ুন, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

আর হতাশা নয় সফলতার জন্য ™ শেষ দর্শন আজমেরী জেমস হাউস লিঃ মানবসেবায়

শেষ দর্শন আজমেরী জেমস হাউস লিঃ

দোকান # ৭৩, ৭৪, ৮৭, ১০০, ব্লক # ডি, লেবেল # ১, বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স, ঢাকা-১২১৫
ফোনঃ ৪৮৯১০৮৭৫, ৪৮১২০৯৫০, মোবাইল ঃ ০১৭১১৫৯৪০৮৮, ০১৭৭৭০০৩৩৪৪, ০১৭৭৭০০৩৩৮৮

https://www.youtube.com/ajmerigemshouse https://www.facebook.com/litondewanchishti ajmerigemshousebd@gmail.com

সাত বছরে সড়কে নিহত ৪৫ হাজারের বেশি

ঝুঁকি বাড়াচ্ছে ব্যাটারিচালিত রিকশা



অপরাধচিত্র প্রতিবেদক : দেশের সড়কে প্রাণহানি থামছে না। প্রায় সাত বছরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে ৪৫ হাজার ২৫২ জন। অতিরিক্ত গতি, বেপরোয়া চালনা, ত্রুটিপূর্ণ যান ও দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এর বড় কারণ। এর সঙ্গে বাড়তি ঝুঁকি যোগ করছে অনিয়ন্ত্রিত ব্যাটারিচালিত রিকশা ও তিন চাকার যান। এসব যানের সংখ্যা দ্রুত বাড়লেও নিবন্ধন, চালকের প্রশিক্ষণ ও চলাচল নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। ফলে যানজট ও বিশৃঙ্খলার পাশাপাশি দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের (আরএসএফ) তথ্য অনুযায়ী, ২০২০-২৫ সাল পর্যন্ত ছয় বছরে ৩৮ হাজার ৩৫৭টি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৪০ হাজার ৬০৫ জন ও আহত ৬৭ হাজার ৩৬৪ জন। ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আরো ৫ হাজার ৯৩টি দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে ৪ হাজার ৬৪৭ জনের। সব মিলিয়ে এ সময়ে দুর্ঘটনা ঘটেছে ৪৩ হাজার ৪৫০টি।

আরএসএফের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান বলেন, 'সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ক্রমেই বাড়ছে। ভ্রমণরত পুরো পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুও উদ্বেগজনক।'

তাদের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ৬ বছর ১০ মাসে প্রায় ৩০০টি পরিবার সড়ক দুর্ঘটনায় পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

তিন চাকার যানের দুর্ঘটনা বাড়তি উদ্বেগ তৈরি করছে। আরএসএফের তথ্য বলছে, ২০২৫ সালেই অটোরিকশা ও তিন চাকার যানের দুর্ঘটনায় সারা দেশে মারা গেছে ১ হাজার ৩৭৬ জন। ২০২০ থেকে ২০২৬ সালের জুলাই পর্যন্ত এ সংখ্যা ৭ হাজার ৬০৪। এ সময়ে তিন চাকার ১২ হাজারের বেশি যান দুর্ঘটনায় পড়েছে। তবে এ হিসাবে সিএনজিচালিত অটোরিকশাও আছে।

দেশে ব্যাটারিচালিত রিকশা কতটি চলছে, তা নিয়ে একেক সংস্থার হিসাব একেক রকম। আরএসএফের পর্যবেক্ষণে এ সংখ্যা অন্তত ৮০ লাখ, যার ৩০ লাখের বেশি রাজধানীতে। সংস্থাটির মতে, প্রতিদিন নতুন যুক্ত হচ্ছে অন্তত তিন হাজার। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) ধারণা, ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক ৪৫-৫০ লাখ। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) হিসাবে প্রায় ৬০ লাখ, যার মধ্যে ২০ লাখ ঢাকায় চলে।

সারা দেশে তিন ধরনের ব্যাটারিচালিত যান চলছে। প্রথমটি প্যাডেল রিকশায় ব্যাটারি ও মোটর বসিয়ে তৈরি। দ্বিতীয়টি রিকশার আদলে নতুন বানানো হুডযুক্ত অটোরিকশা। তৃতীয়টি ইজিবাইক। রাজধানীতে অটোরিকশা বেশি চলে।

ঢাকার বাইরে ইজিবাইক ও মফস্বলে ব্যাটারিচালিত ভ্যানের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনে নিবন্ধিত প্যাডেল রিকশা ২ লাখ ২০ হাজারের বেশি। খাতসংশ্লিষ্টদের হিসাবে নিবন্ধনের বাইরে আছে আরো প্রায় ১০ লাখ। প্রচলিত আইনে ব্যাটারিচালিত তিন চাকার যান নিবন্ধনের ব্যবস্থাই নেই। তাই রাজধানীতে কতটি যান্ত্রিক রিকশা চলছে, তার নির্ভরযোগ্য সরকারি হিসাবও নেই। সম্প্রতি সিটি করপোরেশন এলাকার জন্য ই-রিকশা চলাচলের বিধিমালা জারি হয়েছে। তবে এর কার্যকারিতা এখনো দেখার বিষয়।

চালকদের অভিজ্ঞতার ঘাটতিও বড় ঝুঁকি। 'আরবান মবিলিটি স্টাডি: রিকশা ইন ট্রানজিশন' শীর্ষক গবেষণায় দেখা গেছে, অটোরিকশার ৭৫ শতাংশ চালকের এ ধরনের যান চালানোর অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রায় ৬০ শতাংশের অভিজ্ঞতা দুই বছরের কম। অথচ প্যাডেল রিকশাচালকদের গড় অভিজ্ঞতা ১৫ বছর। অনেক চালক ট্রাফিক আইন মানেন না। উল্টো পথে চলা, যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে যাত্রী তোলা এবং ব্যস্ত ফ্লাইওভার বা মহাসড়কের লেনে ওঠার কারণে দ্রুতগতির যানের সঙ্গে সংঘর্ষের ঝুঁকি বাড়ছে। নির্দিষ্ট মানদণ্ড ছাড়াই রিকশা সংযোজন করাও বিপজ্জনক।

গবেষণার জরিপ বলছে, অটোরিকশার ৩০ শতাংশ যাত্রী দুর্ঘটনার শিকার হয়। প্যাডেল রিকশার ক্ষেত্রে এ হার ১৮ শতাংশ। অটোরিকশার দুর্ঘটনায় ৪৪ শতাংশ যাত্রী অত্যন্ত গুরুতর আহত হয়, যা প্যাডেল রিকশার চেয়ে ২৯ শতাংশ বেশি।

আরএসএফ দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে অতিরিক্ত গতি ও বেপরোয়া চালনাকে চিহ্নিত করেছে। এছাড়া ত্রুটিপূর্ণ যান, অদক্ষ চালক, দুর্বল সড়ক অবকাঠামো, অনিয়ন্ত্রিত কর্মঘণ্টা, দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও আইন লঙ্ঘনকে দায়ী করেছে সংস্থাটি। গণপরিবহনে চাঁদাবাজি ও বিআরটিএর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতিও কারণ হিসেবে এসেছে।

বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. সামছুল হক বলেন, 'শুধু অভিযান চালিয়ে ব্যাটারিচালিত রিকশা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এতে চালকদের ওপর চাপ পড়ে, কিন্তু অবৈধ আমদানিকারক, যন্ত্রাংশ ব্যবসায়ী, বডি নির্মাতা ও তাদের পেছনের প্রভাবশালীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যান। সমস্যার শেকড়ে পৌঁছতে এসব ব্যবসার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। একই সঙ্গে আমদানি ও নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ এবং রিকশার সংখ্যা ও চলাচল ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।'

বিপিসি'র আহম্মদুল্লাহ ও আশিকের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ

অভিযোগ তদন্তেও ঘটছে 'অনিয়ম'

অপরাধচিত্র প্রতিবেদক : বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) চেয়ারম্যানের সাবেক পিএস মো. আহম্মদুল্লাহ ও আশিক শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। দুজনই প্রতিষ্ঠানের উপ-ব্যবস্থাপক। অভিযোগ তদন্তে গঠিত কমিটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। সেই তদন্ত কমিটির বিরুদ্ধেও উঠেছে অনিয়মের অভিযোগ।

সরকারের কেন্দ্রীয় 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা' (জিআরএস) পোর্টালে দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আসা সুনির্দিষ্ট অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি চেয়ারম্যানের পিএসের পদটি গুরুত্ব বিবেচনায় তিন বছর পর কর্মকর্তা বদলের সুপারিশ করা হয়।

সরেজমিনে অনুসন্ধানে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের বসুন্ধরা রিভারভিউ প্রকল্পে সাবেক পিএস আহম্মদুল্লাহর স্ত্রীর নামে আট তলা একটি নির্মাণাধীন ভবনের সন্ধান পাওয়া যায়। এ নিয়ে গণমাধ্যমে প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়। জিআরএসে আসা অভিযোগে ওই ভবনের তথ্য উল্লেখ থাকলেও তদন্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে পুরো বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। তারা ভবনটির খোঁজই করেননি।



এ বিষয়ে কথা হলে বিপিসির সচিব শাহিনা সুলতানা বলেন, 'তদন্ত প্রতিবেদন আমরা পেয়েছি। যেহেতু জিআরএসে অভিযোগগুলো এসেছিল, আমরা জিআরএসে আপলোড দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু খুব টেকনিক্যাল কারণে হয়তো প্রতিবেদনটি আপলোড দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা সরাসরি প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। তবে তদন্তের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করছে।'

এর আগে চলতি বছরের জুন মাসের শুরুতে বিপিসি চেয়ারম্যানের সাবেক একান্ত সচিব (পিএস) এবং বর্তমান উপ-ব্যবস্থাপক মো. আহম্মদুল্লাহ এবং আরেক উপ-ব্যবস্থাপক (বোর্ড) আশিক শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে শত কোটি টাকার অনিয়ম, দুর্নীতি ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ জমা হয় সরকারি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা- জিআরএসে (গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম)। অভিযোগ ওঠা দুই কর্মকর্তাই ঝালকাঠি জেলা সদরে কাছাকাছি গ্রামের বাসিন্দা। আহম্মদুল্লাহ বর্তমানে ওএসডি হয়ে মেঘনা পেট্রোলিয়ামের ঢাকা লিয়াজোঁ অফিসে সংযুক্ত আছেন।

ওই অভিযোগের পর গত ১৮ আগস্ট বিপিসির সচিব শাহিনা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে বিপিসির প্রশাসন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিনকে আহ্বায়ক এবং নিরীক্ষা বিভাগের ব্যবস্থাপক মো. বদরুল ইসলাম ফকিরকে সদস্য সচিব করে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে ২০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরে তদন্ত কমিটির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তের মেয়াদ আরও ১০ দিন বাড়ানো হয়। গত ৫ অক্টোবর বিপিসি চেয়ারম্যান বরাবর প্রতিবেদন জমা দেয় তদন্ত কমিটি।

অভিযোগের বিষয়ে বিপিসির সংস্থাপন শাখা থেকে নিয়োগ সংক্রান্ত নথি, ব্যক্তিগত নথি ও সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

তদন্ত কমিটি প্রতিবেদনে তাদের মতামতের অংশে উল্লেখ করে- অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ, সংগৃহীত নথিপত্র, তথ্য-উপাত্ত ও বক্তব্য বিশ্লেষণপূর্বক পর্যালোচনায় উপ-ব্যবস্থাপক মো. আহম্মদুল্লাহ এবং আশিক শাহরিয়ারের মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ পেয়েছেন এবং তাদের নিয়োগে জেলা কোটা প্রযোজ্য হয়নি।

আহম্মদুল্লাহর বিরুদ্ধে টেন্ডার বাণিজ্য, কমিশন বাণিজ্য, বদলি, এফডিআর থেকে কমিশন, এলসি সংক্রান্ত ও মোটা অংকের চাঁদা আদায়সহ অন্য অপরাধে জড়িত থাকার বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট ও যাচাইযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করে তদন্ত কমিটি। তাছাড়া আহম্মদুল্লাহর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন সংক্রান্ত দুদকে একটি অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন। যেহেতু দুদকে অনুসন্ধানাধীন, সেহেতু এটি অনুসন্ধান শেষে কার্যক্রম গ্রহণ করা সমীচীন হবে মর্মে কমিটির কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।

এতে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের অভিযোগের মূল বিষয়টি যাচাই ছাড়াই

বসুন্ধরা রিভারভিউ প্রকল্পে তার স্ত্রীর নামে নিবন্ধিত ওই প্লটে ভবন নির্মাণ চলমান থাকলেও ভবনে চট্টগ্রামভিত্তিক বাশার গ্রুপ অব কোম্পানির মালিক আবুল বশর আবুর নামে নেমপ্লেট দেখা গেছে



প্রতিবেদন জমা দেয় তদন্ত কমিটি। কমিটি দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো সুপারিশ না দিলেও সামগ্রিকভাবে তিনটি সুপারিশ দেয়। তবে সরকারি প্রতিষ্ঠানে তিন বছর অন্তর বদলির নির্দেশনা থাকলেও বিপিসিতে তা মানা হচ্ছে না বলে প্রতিবেদনের সুপারিশে উল্লেখ করা হয়।

এজন্য বিপিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তিন বছর অন্তর বদলি সমীচীন হবে। চেয়ারম্যানের একান্ত সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত সহকারী পদগুলো খুবই স্পর্শকাতর বলে উল্লেখ করা হয়। নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগবিধি ও প্রবিধানমালা অনুযায়ী সতর্কতার সঙ্গে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পাদন করার সুপারিশ করা হয়।

এ বিষয়ে কথা হলে কমিটির আহ্বায়ক ও বিপিসির উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মো. নাজিম উদ্দিন বলেন, 'সাবেক পিএস আহম্মদুল্লাহ ও আশিক শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে জিআরএসে আসা অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। দুই কর্মকর্তার নিয়োগ ও পদায়নের অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।'

৮ তলা বাড়িসহ অবৈধ সম্পদের তদন্তের বিষয়ে প্রশ্ন করলে দুদক এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করছে বলে তিনি এড়িয়ে যান। তদন্তে অনিয়মের বিষয়টি অস্বীকার করেন। প্রতিবেদন তৈরিতে চাপ ছিল না দাবি করে কমিটির সদস্য সচিব ও বিপিসির ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা) মো. বদরুল ইসলাম ফকির বলেন, 'আমরা কিছু ডকুমেন্ট দেখে বাস্তবতার নিরিখে প্রতিবেদন দিয়েছি।'

তবে বিপিসির ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা বলেন, 'তদন্ত কমিটি মূল প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দিয়েছে।'

অনুসন্ধানে জানা যায়, বিপিসি চেয়ারম্যানের সাবেক পিএস আহম্মদুল্লাহ নিজের স্ত্রীর নামে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের বসুন্ধরা রিভারভিউ প্রকল্পে তার স্ত্রী নুসরাত জেবিন সিনথীর নামে কেনা প্লটে আট তলা ভবনের নির্মাণকাজ চলমান। আহম্মদুল্লাহর গ্রামের বাড়ি ঝালকাঠিতে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের বিলাসবহুল ডুপ্লেক্স বাড়ির সন্ধানও মিলেছে।

বসুন্ধরা রিভারভিউ প্রকল্পে তার স্ত্রীর নামে নিবন্ধিত ওই প্লটে ভবন নির্মাণ চলমান থাকলেও ভবনে চট্টগ্রামভিত্তিক বাশার গ্রুপ অব কোম্পানির মালিক আবুল বশর আবুর নামে নেমপ্লেট দেখা গেছে। মূলত আবুল বাশার আবুর শিপিংসহ নানাখাতের ব্যবসা রয়েছে। ওই ব্যবসায়ীর ২২টির মতো ট্যাংকার জাহাজ রয়েছে। যেগুলোর বেশিরভাগ জ্বালানি তেল পরিবহন করে। বিপিসির তিন বিপণন প্রতিষ্ঠান পদ্মা, মেঘনা, যমুনা অয়েলের চার্টারে যুক্ত আছে আবু মালিকানাধীন বেশ কয়েকটি জাহাজ।

সারাদেশে অবৈধ ইটভাটা বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশ

অপরাধচিত্র প্রতিবেদক : সারাদেশের অবৈধ ইটভাটা বন্ধে সব বিভাগীয় কমিশনার ও পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ আদেশ প্রতিপালন করে আগামী ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি আজিজ আহমদ ভূঞার হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। ইটভাটা মালিকদের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ আলী।

পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী মুনতাসির উদ্দিন আহমেদ। আইনজীবী মনজিল মোরসেদ জানান, এইচআরপিবির করা জনস্বার্থের মামলায় হাইকোর্ট ২০২২ সালের ১৩ নভেম্বর রুল জারি করে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেন। একপর্যায়ে ইটভাটা মালিক সমিতির পক্ষে এই মামলায় আবেদন দাখিল করে আদালতের আদেশ সংশোধনের প্রার্থনা করে নির্দেশনা চান। কিন্তু আদালত সকল অবৈধ ইটভাটা বন্ধ করে আদালতের প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। ওই নির্দেশনা দেওয়ার পরে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। পরবর্তীতে ইটভাটা মালিকদের পক্ষ হতে আদেশ সংশোধন করে জিগজ্যাগ সম্পর্কিত ইটভাটাকে আদেশের বাইরে রাখার প্রার্থনা করেন এবং শুনানি শেষে হাইকোর্ট বিভাগ ইটভাটা মালিকদের আবেদন সংশোধন করলেও অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদের আদেশ বহাল রাখেন।

এ আদেশের পরে বিভিন্ন ইটভাটার মালিকরা একাধিক আপিল দায়ের করে আদেশের উপরে স্থগিতাদেশের প্রার্থনা করলেও তা পাননি। পরবর্তীতে আপিলগুলো আপিল বিভাগে খারিজ হয়। মনজিল মোরসেদ আরও জানান, বর্তমানে বিভিন্ন অবৈধ ইটভাটা মালিকরা পুনরায় তাদের কার্যক্রম শুরু করার পাঁয়তারা করছে মর্মে সংবাদ পেয়ে এইচআরপিবির পক্ষে একটি আবেদন দাখিল করে আদালতে অবৈধ ইটভাটা অপসারণ সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নের প্রতিবেদন দাখিলের প্রার্থনা করা হয়।

আদালত সকল পক্ষের বক্তব্য শুনে এইচআরপিবির করা আবেদন মঞ্জুর করে বাংলাদেশের সকল অবৈধ ইটভাটা বন্ধে ইতোপূর্বে আদালতের বিভিন্ন নির্দেশনা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং সকল বিভাগীয় কমিশনারদেরকে পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন। একইসঙ্গে বৈধ ইটভাটা মালিকদেরকে হয়রানি না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।



আইপিও অনুমোদনে আসছে ওয়ান-স্টপ ব্যবস্থা

অপরাধচিত্র প্রতিবেদক : শেয়ারবাজারে আইপিও অনুমোদনের দীর্ঘসূত্রতা ও জটিলতা কমাতে 'সিঙ্গেল উইন্ডো' বা ওয়ান-স্টপ রিভিউ ব্যবস্থা চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। নতুন ব্যবস্থায় আইপিও আবেদন প্রাথমিকভাবে পর্যালোচনা করবে স্টক এক্সচেঞ্জগুলো। তাদের নিজস্ব অনুসন্ধান ও বিএসইসির পর্যবেক্ষণ সমন্বয় করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কমিশনে সুপারিশ পাঠানো হবে।

সম্প্রতি বিএসইসির চেয়ারম্যান মাসুদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিশন সভায় শেয়ারবাজারের গতি ফেরাতে একাধিক সংস্কারমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রায় তিন বছর ধরে চলা আইপিও-খরার মধ্যে সম্প্রতি কয়েকটি কম্পানি মূলধন সংগ্রহের জন্য আবেদন করেছে। এমন সময়ে নতুন এই ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগে আইপিও অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি কমবে এবং আবেদন নিষ্পত্তির সময় কমবে বলে মনে করছেন বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

বর্তমানে আইপিও আবেদনের বিভিন্ন ধাপে একাধিক পক্ষের যাচাই-বাছাইয়ের কারণে প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হয়। নতুন ব্যবস্থায় স্টক এক্সচেঞ্জের পর্যালোচনার সঙ্গে কমিশনের পর্যবেক্ষণ সমন্বয় করে একটি সমন্বিত পর্যালোচনা কাঠামো তৈরি হবে। এরপর বিএসইসি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে। স্টকব্রোকার ও মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর দীর্ঘদিনের আর্থিক চাপ কমাতে নেতিবাচক ইকুইটি ও অবাস্তবায়িত লোকসান সমন্বয়ের সময়সীমা ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাড়িয়েছে বিএসইসি।

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকা নেতিবাচক ইকুইটির বিপরীতে ২০২৭ সাল থেকে ন্যূনতম ২৫ শতাংশ হারে প্রভিশন রাখতে হবে। তবে সময় বাড়ানোর সুবিধার পাশাপাশি অপব্যবহার ঠেকাতে কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

বিএসইসির এসব সিদ্ধান্তকে শেয়ারবাজারের দীর্ঘদিনের কাঠামোগত জটিলতা কমানোর উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বিশেষ করে আইপিও অনুমোদনে একক ও সমন্বিত পর্যালোচনা ব্যবস্থা চালু হলে আবেদন নিষ্পত্তির সময় কমার পাশাপাশি কম্পানিগুলোর জন্য মূলধন সংগ্রহের প্রক্রিয়াও সহজ হতে পারে

নেতিবাচক ইকুইটি সমন্বয়ের বর্ধিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নগদ লভ্যাংশ দিতে পারবে না। একই সঙ্গে নেতিবাচক ইকুইটির বিপরীতে নতুন করে মার্জিন ঋণ দেওয়া এবং ব্লক মার্কেটে লেনদেন করাও নিষিদ্ধ থাকবে। বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, দীর্ঘদিনের নেতিবাচক ইকুইটির চাপ একসঙ্গে সমন্বয় করতে গেলে অনেক প্রতিষ্ঠান আর্থিক সংকটে পড়তে পারে। সময় বাড়ানোর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো ধাপে ধাপে এই চাপ সামাল দেওয়ার সুযোগ পাবে। তবে শর্তগুলো কার্যকরভাবে মানানো জরুরি।

মূল বোর্ডে যাবে বন্ড : বিনিয়োগকারীদের জন্য বন্ডের লেনদেনের সুযোগ বাড়াতে অলটারনেট ট্রেডিং বোর্ডে (এটিবি) তালিকাভুক্ত এবং তালিকাভুক্তির অপেক্ষায় থাকা বন্ডগুলোকে স্টক এক্সচেঞ্জের মূল বোর্ডে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএসইসি।

এ জন্য বন্ডের ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জের মূল বোর্ডে তালিকাভুক্তির প্রয়োজনীয় আবেদন করতে বলা হয়েছে। বিএসইসির মতে, মূল বোর্ডে বন্ড স্থানান্তর হলে এসব সিকিউরিটিজের লেনদেন ও বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়বে। এতে শেয়ারবাজারে পুঁজির নতুন উৎস হিসেবে বন্ড মার্কেটের কার্যক্রমও গতিশীল হতে পারে।

লভ্যাংশ হিসাব পরিচালনায় নিষেধাজ্ঞা শিথিল : তালিকাভুক্ত কম্পানির পরিচালক ও কোনো ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য একই ব্যক্তি হওয়ার কারণে এত দিন ওই ব্যাংকে ডিভিডেন্ড অ্যাকাউন্ট বা লভ্যাংশ হিসাব পরিচালনায় যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা সংশোধন করে শিথিল করেছে বিএসইসি। এর ফলে তালিকাভুক্ত কম্পানিগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে লভ্যাংশ বিতরণসহ অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম আরো সহজে পরিচালনা করতে পারবে।

বিএসইসির এসব সিদ্ধান্তকে শেয়ারবাজারের দীর্ঘদিনের কাঠামোগত জটিলতা কমানোর উদ্যোগ হিসেবে দেখছেন বাজারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। বিশেষ করে আইপিও অনুমোদনে একক ও সমন্বিত পর্যালোচনা ব্যবস্থা চালু হলে আবেদন নিষ্পত্তির সময় কমার পাশাপাশি কম্পানিগুলোর জন্য মূলধন সংগ্রহের প্রক্রিয়াও সহজ হতে পারে। তবে নতুন ব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ভর করবে স্টক এক্সচেঞ্জ ও কমিশনের মধ্যে সমন্বয় এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ওপর।



ধর্মঘট-আন্দোলনে রণক্ষেত্র স্পেন

অপরাধচিত্র ডেস্ক : আবাসন সংকট ও জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার প্রতিবাদে স্পেনের প্রধান শ্রমিক সংগঠনগুলোর ডাকা সাধারণ ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন লাখো মানুষ। দেশটির ৪০ লাখ শ্রমিকের বৃহত্তম ইউনিয়নগুলো ২০১২ সালের পর প্রথমবারের মতো স্পেনে ধর্মঘটের ডাক দেয়। স্থানীয় সময় গত বুধবারের এই ধর্মঘটে রাজধানী মাদ্রিদে ১ লাখ ২০ হাজার ও বার্সেলোনায় ৫০ হাজারের বেশি মানুষ রাস্তায় নামেন। তবে দিনভর শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের পর বার্সেলোনায় মুখোশধারী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বার্সেলোনায় বিক্ষোভের সময়ের ভিডিওতে দেখা যায়, মুখোশধারী ব্যক্তিরা ময়লা ফেলার বিনে আগুন দিচ্ছেন এবং দোকানের জানালা ভাঙচুর করছেন। এ সময় পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। ধর্মঘটের ফলে স্পেনজুড়ে পরিবহন ও অন্যান্য সরকারি সেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যায় বার্সেলোনার কেন্দ্রীয় এলাকায় পুলিশের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা যায়। পুলিশ সদস্যদের মাথায় হেলমেট এবং হাতে দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের ঢাল ছিল। শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিখ্যাত প্লাসা দে কাতালুনিয়ার কাছের পাসেই দে গ্রাসিয়া এলাকায় কয়েকটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, একদল ব্যক্তি পুলিশের দিকে আতশবাজি ছোড়েন। পাশাপাশি লেগোসহ বিভিন্ন দোকানে লুটপাট চালান। বিক্ষোভকারীদের অ্যাপল স্টোরে ঢোকার চেষ্টাও করতে দেখা যায়। বিবিসি বার্সেলোনায় বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এক নারীর সঙ্গে কথা বলেছে। তিনি বলেন, বিক্ষোভ বেশিরভাগ সময় ছিল শান্তিপূর্ণ ও 'উৎসবমুখর'। আবাসন ব্যয়ের প্রতিবাদ জানাতে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'সেখানে অনেক শিশু ও বয়স্ক মানুষও ছিলেন।' তবে সন্ধ্যায় ওই নারী বিক্ষোভকারী লাস রামব্লাস এলাকায় ছিলেন। ওই সময় তিনি রাস্তায় আগুন জ্বলতে দেখেন। তিনি বলেন, 'চারদিকে আগুন জ্বলছিল। পরিস্থিতি ছিল খুবই উত্তেজনাপূর্ণ।'

দেশটির বৃহৎ শ্রমিক সংগঠন ইউজিটির প্রধান পেপে আলভারেজ বলেছেন, বিপুলসংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ধর্মঘট সফল হয়েছে। আরেক শ্রমিক সংগঠন সিসি ওওর নেতা উনাই সোর্দো বলেছেন, ধর্মঘটে অংশগ্রহণের হার ছিল 'খুবই উল্লেখযোগ্য'। স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিভিন্ন ঘটনায় কয়েক ডজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আবাসন ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন কার্যালয়েও হামলা হয়েছে। মাদ্রিদে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এক ব্যক্তি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, 'আমরা পুরো শহর অচল করে দিয়েছি।' সাধারণ ধর্মঘটের প্রতি মানুষের ব্যাপক সমর্থন রয়েছে বলেও জানান তিনি। ওই ব্যক্তি আরও বলেন, 'বৃষ্টির আবহাওয়া সত্ত্বেও সবাই বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছে।' ৩৭ বছর বয়সী শিক্ষক ওলগা দোমিঙ্গোও বিক্ষোভে অংশ নেন। তিনি বলেন, 'আবাসন পরিস্থিতি ভয়াবহ। বর্তমান বেতনের তুলনায় জীবনযাত্রার ব্যয় এতটাই বেশি যে এভাবে চলা অসম্ভব।'

সাশ্রয়ী আবাসনের অভাব ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভের ধারাবাহিকতায় এ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। বিক্ষোভের সূত্রপাত মাদ্রিদের একটি ফ্ল্যাট থেকে ৮৭ বছর বয়সী মারিকারমেন আবাসকাল নামের এক নারীকে উচ্ছেদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ওই ফ্ল্যাটে তিনি সাত দশক বসবাস করছিলেন। উচ্ছেদের কয়েক সপ্তাহ পর হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় স্পেনের রাজধানীতে বাড়িভাড়া বেড়েছে। আবাসনবিষয়ক ওয়েবসাইট আইডিয়ালিস্তার তথ্য অনুযায়ী, অক্টোবরে মাদ্রিদে ৫০ বর্গমিটারের (প্রায় ৫৩৮ বর্গফুট) একটি ফ্ল্যাটের গড় মাসিক ভাড়া ছিল ১ হাজার ১৭০ ইউরো। অন্যদিকে স্পেনের কর্মীদের গড় মাসিক বেতন প্রায় ২ হাজার ৪৬০ ইউরো। অর্থাৎ ফ্ল্যাটের ভাড়া গড় বেতনের প্রায় অর্ধেক। অথচ আবাসন বিশেষজ্ঞ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সুপারিশ অনুযায়ী, বাড়িভাড়া আয়ের ৩০ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়।

আগামী ২৯ নভেম্বর স্পেনে পার্লামেন্ট নির্বাচন। সমাজতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের আবাসন সংস্কার পরিকল্পনা পার্লামেন্টে অনুমোদন পেতে ব্যর্থ হওয়ার পর গত মাসে আগাম নির্বাচনের ডাক দেন। আগের সাধারণ ধর্মঘটগুলো ক্ষমতাসীন সরকারের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ালেও, এবারের ধর্মঘট ভিন্ন। প্রধানমন্ত্রী সানচেজ ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যরা বরং শ্রমিকদের কাজ বন্ধ রেখে সাশ্রয়ী আবাসনের দাবিতে আন্দোলনে নামতে উৎসাহিত করেছেন।

নতুন সিনেমায় তুষির চমক



অপরাধচিত্র প্রতিবেদক: ঢাকাই চলচ্চিত্রের আলোচিত অভিনেত্রী নাজিফা তুষি আবারও বড়পর্দায় ফিরছেন নতুন গল্প নিয়ে। শঙ্খ দাশগুপ্ত পরিচালিত 'আবার দেখা হলে' সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন তিনি। এতে তুষির বিপরীতে থাকছেন সিয়াম আহমেদ। এর মাধ্যমে প্রথমবারের মতো পর্দায় জুটি হয়ে আসছেন সিয়াম-তুষি। নতুন এই জুটিকে ঘিরে ইতিমধ্যে দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আগ্রহ।

২০২৭ সালের পবিত্র ঈদুল ফিতরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পরিকল্পনা নিয়ে নির্মিত হচ্ছে সিনেমাটি। এতে তুষি ও সিয়ামের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। আরও রয়েছেন দীপা খন্দকার, আজিজুল হাকিম, বিজরী বরকতউল্লাহ ও রেজওয়ান পারভেজ। সব মিলিয়ে অভিজ্ঞ ও জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে সাজানো হয়েছে সিনেমাটির চরিত্রের তালিকা।

'আবার দেখা হলে' শঙ্খ দাশগুপ্তের দ্বিতীয় সিনেমা। এর আগে তার পরিচালিত 'প্রিয় মালতী' সিনেমাটি দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছিল। নির্মাতার পরিচালনায় চলতি বছর চরকিতে মুক্তি পাওয়া 'চা গরম' সিনেমাটিও দর্শক-সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে।

পারিবারিক আবহ ও মধ্যবিত্ত জীবনের নানা অনুভূতিকে কেন্দ্র করে নির্মিত হচ্ছে 'আবার দেখা হলে'।

সিনেমার গল্প প্রসঙ্গে শঙ্খ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, এতে রয়েছে আবেগ, পারিবারিক মূল্যবোধ, বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব ও নাটকীয়তা। তবে গল্পটি কেবল গম্ভীর আবহে সীমাবদ্ধ নয়, মূল আবেগের পাশাপাশি থাকবে হাস্যরসও। নির্মাতার ভাষায়, এটি মূলত নিজেকে ফিরে পাওয়ার গল্প। নিজের ফেলে আসা সময়, স্মৃতি ও শিকড়কে নতুন করে খুঁজে দেখার মধ্য দিয়ে এগোবে সিনেমার কাহিনি।

সিনেমাটির চিত্রনাট্য লিখেছেন মো. সাইফুল্লাহ রিয়াদ। প্রযোজনা করছে ফিল্মি ফিচারস। সহ-প্রযোজক ও অফিসিয়াল ডিজিটাল পার্টনার হিসেবে যুক্ত হয়েছে চরকি এবং এমআইবি স্টুডিওস। সিনেমাটির সহ-প্রযোজক চরকির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেদওয়ান রনিও মনে করেন, পারিবারিক সম্পর্ক ও আত্ম-অনুসন্ধানের গল্পটি দর্শকদের জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতা তৈরি করবে।

প্রসঙ্গত, রেদওয়ান রনির 'আইসক্রিম' সিনেমার মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে নাজিফা তুষির। দ্বিতীয় সিনেমা 'হাওয়া'-এ অভিনয় করে দর্শকের কাছে বিশেষ পরিচিতি পান। চলতি বছরে 'রঈদ' সিনেমা নিয়ে নতুন করে আলোচনায় আসেন তুষি। ক্যারিয়ারে সিনেমার সংখ্যা কম হলেও অভিনয়ের স্বতন্ত্র ধরন ও চরিত্র নির্বাচনের কারণে আলাদা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে এই অভিনেত্রীর। এবার আবার দেখা হলেতে সিয়াম আহমেদের সঙ্গে তার প্রথম জুটি দর্শকদের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করে, সেটিই দেখার বিষয়। তবে নতুন এই সিনেমার মাধ্যমে বড়পর্দায় তুষির অভিনয়ে আরও একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতা যুক্ত হতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন সিনে-সংশ্লিষ্টরা।

ইসলামী ব্যাংক
বাংলাদেশ পিএলসি | ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত

বাংলা QR

স্ক্যান করে পেমেন্ট করুন

সেলফিন অ্যাপে

স্মার্ট পেমেন্ট এখন হাতের মুঠোয়



GET IT ON Google Play

Available on the App Store













বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সেবাসমূহ

- সঞ্চয়ী, চলতি ও এসএ নডি হিসাব
- সুদমুক্ত সঞ্চয়ী হিসাব
- স্কুল ব্যাংকিং হিসাব
- বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়ী স্কিম
- তারুণ্য সঞ্চয় স্কিম
- সকল প্রকার কৃষি ঋণ
- এসএমই (SME) ঋণ
- কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ঋণ
- বৈদেশিক রেমিট্যান্স প্রদান
- বৈদেশিক আমদানি-রপ্তানি ঋণ
- চার্জ ফ্রী আরটিজিএস (RTGS)
- সকল সরকারি চালান গ্রহণ
- এটিএম (ATM) বুথ সুবিধা (জমা ও গ্রহণ)

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

গণমানুষের ব্যাংক